সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

ফজিলতুননেসা জোহা

বাংলায় উচ্চশিক্ষার পথে অগ্রণী নারী

বিশিষ্ট ব্যাংকার ও সিদীপের সাধারণ পর্ষদের সদস্য এ.এফ.এম. শামসুদ্দীন
২০২১এর ২১ এপ্রিল কোভিড-১৯এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।
আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত।
– সিদীপ পরিবার

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

শিক্ষালোক

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ ● ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

সূচি

বাংলায় উচ্চশিক্ষার পথে অগ্রণী নারী - সালেহা বেগম ৩

কবিকণ্ঠের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই - শ্যামল দত্ত ৬

বিজ্ঞানচর্চা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়-আলমগীর খান ৯

মূল্যবোধ শিক্ষা - পপি খাতুন ১১

পড়ালেখার বাইরেও শিশুর মেধা বিকাশ - অলোক আচার্য ১২

আমার শখ বই পড়া - কাকলী খাতুন ১৪

ভয় করি না - বিদ্যুৎ কুমার রায় ১৫

বাবাদের কথা - আশরাফ আহমেদ ১৬

তাঁকে যেমন দেখেছি - আরশাদ সিদ্দিকী ২০

ব্যতিক্রমী উৎকর্ষতার প্রয়াস 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' সাময়িকী ২১

'আমাদের শিক্ষা নানা চোখে' বই প্রসঙ্গে - নাহিদা হক ২৪

শংকর দাশের কাব্য 'গৃহে গৃহে জাগ্রত পা'-মাহ্‌ফুজ সালাম ২৫

সুস্থ মানবিক সম্পর্কই সব সংগঠনের প্রাণ-শাহজাহান ভুঁইয়া ২৭

প্রধান সম্পাদক

মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক

ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক

আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ

আইআরসি irc.com.bd

সম্পাদকীয়

দেশ করোনাভাইরাসজনিত সংকট কাটিয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এসবই আশার কথা। তবে ক্ষতি কাটিয়ে উঠে মানুষের জীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লাগবে। আর তাই হাতে হাত রেখে কাজ করে যেতে হবে আমাদের সবাইকে। শিক্ষাক্ষেত্রের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কাজ করতে হবে আরও বেশি।

যে কোনো দুর্যোগে নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই অতিমারিতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। অথচ সাম্প্রতিককালে এ দিক থেকে বাংলাদেশের বেশ কিছু অর্জন আছে। কোভিড-দুর্যোগ কেটে যেতে যেতে আশা করছি আমাদের দেশ এ অর্জনসমূহ কেবল ধরে রাখতে নয়, এগিয়ে নিতেও সক্ষম হবে।

বাংলাদেশে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ফজিলতুননেসা একটি উজ্জ্বল নাম। প্রগতিশীল, সাহসী ও বিদুষী এ নারী বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার নারীসমাজকে উজ্জীবিত করেছেন তার সাফল্য, ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তা দিয়ে। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বাংলার সর্বপ্রিয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও। আপন কৃতিত্বে ভাস্বর এ মহীয়সী নারীকে নিয়ে শিক্ষালোকের এবারকার প্রচ্ছদ ও প্রধান লেখা। ফজিলতুননেসার পথ ধরে আরও এগিয়ে যাক আমাদের নারীসমাজ।

আজকের যুগে যথোপযুক্ত বিজ্ঞানচর্চা বাদ দিয়ে দেশের অগ্রগতির কথা ভাবা যায় না। আমাদেরকেও এ বিষয়ে জাতীয়ভাবে ভাবতে ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। চলতি সংখ্যায় এ বিষয়ক লেখাটি সেক্ষেত্রে কিছু দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

উন্নয়ন বিষয়ক লেখক শাহজাহান ভুঁইয়ার সংগঠনে আকাঙ্ক্ষিত মানবিক সম্পর্কের মূল্য নিয়ে লেখাটি আমাদের সকল সামাজিক ও জাতীয় যৌথ কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে সাহায্য করবে বলে আশা করি।

শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, বই-আলোচনা ইত্যাদি দিয়ে সাজানো সংখ্যাটি আশা করছি সবারই ভাল লাগবে।

ফজলুল বারি

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।

Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

ফজিলতুননেসা জোহা

বাংলায় উচ্চশিক্ষার পথে অগ্রণী নারী

সালেহা বেগম

ফজিলতুননেসা ১৮৯৯ সালে টাঙ্গাইলের কুমুল্লী নামদার গ্রামে জন্ম নেন। পিতার নাম ওয়াহেদ আলী খাঁ এবং মাতা হালিমা খাতুন। তাঁর পিতা ওয়াহেদ আলী খাঁ ছিলেন কুমুল্লী নামদার গ্রামের মাইনর স্কুলের শিক্ষক। নিজের স্কুলে তিনি কন্যা ফজিলতুননেসাকে ছয় বছর বয়সে ভর্তি করে দেন। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষায় মেয়ের ভালো ফলাফল দেখে পারিবারিক অসচ্ছলতা ও সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে ফজিলতুননেসাকে তিনি শিক্ষার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন। ফজিলতুননেসাও নিজের অধ্যাবসায় ও নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দিশেহারা না হয়ে লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যান দৃঢ়তা নিয়ে।

পিতা ওয়াহেদ আলী খাঁ স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় আসার আগে করটিয়ার জমিদার বাড়ীতে সামান্য একটি চাকরি করতেন জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর (চাঁদ মিয়া) সাথে। ওয়াজেদ আলী খান পন্নী অত্যন্ত দানশীল ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকালে নিজ হাতে দরিদ্রদের দান করতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে সকলের খোঁজখবর নিতেন। শিক্ষা বিস্তার ও জনকল্যাণমূলক কাজে বার্ষিক আয়ের ২০ ভাগ খরচ করতেন। কাজ করার সুবাদে ফজিলতুননেসার বাবার প্রতি উদার ও শিক্ষামনস্ক ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর একটি মমত্ববোধ তৈরি হয়। পড়াশোনার প্রতি ফজিলতুনেসার আগ্রহের কথা জমিদার বাবু জেনে অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁকে পড়া চালিয়ে নেয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। বিভিন্ন সময় তিনি ফজিলতুননেসার পড়ার জন্য অর্থ সাহায্যও করেছেন। জমিদার ওয়াজেদ আলী খানের মতো ব্যাক্তিত্বের স্নেহ, মমতা ও সহযোগিতায় ফজিলতুনেসার উৎসাহ-উদ্দীপনা আরো বেড়ে গেল। ধীরে ধীরে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রতিষ্ঠালগ্নে সমাজের রক্ষণশীলতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে খুব দ্বিধান্বিত ছিলেন। তৎকালীন বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাশ করা লীলা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেন। পিতা গিরীশচন্দ্র নাগ ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট এবং সিলেটের অন্যতম সংস্কৃতমনা ও শিক্ষিত পরিবারের সদস্য। তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রভাবের কারণে লীলা নাগ ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এমএ ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯২৩ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ছাত্রী ছিলেন সুষমা সেনগুপ্ত। ফজিলতুননেসা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ছাত্রী এবং প্রথম উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়া মুসলিম ছাত্রী। সে সময় ঢাকা বিদ্যালয়ে কেবল মাত্র দু'চারজন হিন্দু ও ব্রাহ্ম ছাত্রী ছিল। ফলে হঠাৎ একজন মুসলিম ছাত্রীর আগমন সকলের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো। তখন অবশ্য মুসলিম ছাত্র সংখ্যাও ছিল নেহায়েত হাতে গোনা কয়েকজন।

সত্যিকার অর্থে সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়েই ওঠেনি। ফলে ফজিলতুননেসা কঠিন এক পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। সুশ্রী দীর্ঘাঙ্গী গৌরবর্ণা মেয়েটি মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন। আত্মবিশ্বাসী, অত্যন্ত বিনয়ী ও আত্মসচেতন ফজিলতুননেসা সহপাঠী ও শিক্ষকদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহজ একটি সম্পর্ক গড়ে তোলেন নিজের একাগ্রতা ও মননশীলতা দিয়ে। এখানে উল্লেখ্য যে বাঙালিদের প্রতি একটি অভিযোগ ছিল যে, গড়পরতা বাঙালি অংককে ভয় পায়। মহিলা হয়েও ফজিলতুননেসা অংকে ভর্তি হওয়াতে শুরুতেই অনেকে চমকে উঠেছিলেন এবং তাকে একটু সমীহ করেই চলতেন। শেষ পর্যন্ত ১৯২৭ সালে ফজিলতুননেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ থেকে সম্মিলিতভাবে মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

এম এ পাশের পর ১৯২৮ সালে কিছুদিন তিনি ঢাকার ইডেন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ফজিলতুননেসা ইংল্যান্ডে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে একজন মেয়েকে বিলেত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালো। উচ্চশিক্ষার প্রতি তার প্রবল ইচ্ছা ও একাগ্রতা তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি তৎকালীন সময়ের প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশে সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ 'সওগত' পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের কাছে যান। বুদ্ধিদীপ্ত এ মানুষটি আধুনিক ও মুক্তচিন্তা বিকাশের লক্ষ্যে জগদ্দল অন্ধকার যুগে এদেশের নারী জাগরণ ও সমাজ বির্নিমাণে সাহসী ভুমিকা নিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় বেগম রোকেয়ার মতাদর্শে প্রভাবিত হয়ে নাসিরউদ্দীন নারীশিক্ষা ও নারীর সচেতনতা সৃষ্টির নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, 'নারী না জাগলে জাতি জাগবে না।' নারীদের সাংবাদিকতার মত একটি প্লাটফরম গঠন করে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ করে দেয়ার জন্যে তিনি সর্বজনস্বীকৃত হয়েছেন। নাসিরউদ্দীন সাহেব সাথে নিলেন খান বাহাদুর আবদুল লতিফকে। দুজন মিলে আলাপ-আলোচনা করে উদ্যোগে গ্রহণ করেন।

আন্যদিকে যুগস্রষ্টা নবাব আবদুল লতিফ ছিলেন উনিশ শতকের অন্যতম মুসলিম নেতা। তিনি মুসলিম রেনেসাঁ ও আধুনিকতার অগ্রদূত এবং বাংলার নবজাগরণের একজন স্থপতি ছিলেন। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, এদেশে যুবকদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া উচিত। বিশেষ করে মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে অনীহার কারণে তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। তিনি শিক্ষার

প্রসার ও সমকালীন চিন্তা ধারার অনুকূলে জনমত এবং শিক্ষিত মুসলিম, হিন্দু ও ইংরেজদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি সমিতি গঠন করেন। নবাব আবদুল লতিফ এদেশে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছেন। এই দুই স্বনামধন্য ব্যক্তির সহযোগিতায় ফজিলতুননেসার বিলেত যাওয়ার পথ সুগম হয়।

ফজিলতুননেসার উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাওয়াটা তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের একজন মুসলিম নারীর উচ্চতর শিক্ষার যাত্রায় রূপকথার গল্পের সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হওয়ার মতোই অকল্পনীয় এক ঘটনা ছিলো। ইতিহাস এভাবেই নানা সম্ভার নিয়ে এগোতে থাকে পুরোনো ইতিহাস ভেঙে নতুন ইতিহাস গড়ার প্রত্যয় নিয়ে। এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই নতুন অধ্যায়ের সূচনা তৈরি হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ফজিলতুননেসা উত্তরসূরি মুসলিম মেয়েদের জন্য উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করেন।

বাংলার নিভৃত পল্লীতে ১৮৯৯ সালে জন্ম নেয়া ফজিলতুননেসা সত্যিকার অর্থে একজন বিদূষী নারী ছিলেন। তার জন্ম সেই সময় যখন বাংলার সমাজ ক্রমশ মেনে নিতে শুরু করে যে মেয়েদের আর পড়াশোনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ফলে অতি সাধারণ পরিবারে জন্ম নেয়া ফজিলতুননেসা গভীর ও একাগ্র প্রচেষ্টায় এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়ে তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফল হন। একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে ফজিলতুননেসা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজ মুকুটে যোগ করেছেন অনেকগুলো সাফল্যের গৌরব।

ফজিলতুননেসার বিলেত গমন উপলক্ষে 'সওগত' পত্রিকার পক্ষ থেকে বিশেষ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

ফজিলতুননেসার বিলেত গমন বিষয়টি মুসলিম নারী প্রগতির আদর্শ হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্যে তাকে মুসলিম নারী প্রগতির অগ্রদূত করা হয়। 'সওগত' পত্রিকার পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে বহু প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিলো। সওগত অফিসের দোতলায় অনুষ্ঠিত আয়োজনে সে সময়ের অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছিলো। প্রগতিবাদী অসাম্প্রদায়িক নাসিরউদ্দীন শুধু এই সম্বর্ধনাই নয় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী নবাব মোশারফ হোসেনকে ধরে ফজিলতুননেসার বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থাও করেন। নাসিরউদ্দীন সাহেব পরে বন্ধুদের জানিয়েছিলেন এই বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বহুদিন তিনি প্রাণভয়ে একা সওগত কার্যালয়ের বাইরে বের হননি। উক্ত অনুষ্ঠানে ফজিলতুননেসার বাবা আবদুল ওয়াহেদ খান ও তাঁর বোন শরিফুননেসাও উপস্থিত ছিলেন। এ ছিলো এক ঘটনাবহুল সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সঙ্গত কারণে উদ্যোক্তা সংস্থা সওগতের লোকজনের উৎসাহ ও আগ্রহ ছিলো যথেষ্ট। এছাড়া সে সময়কার তরুণ ব্যারিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর জালালউদ্দিন হাশেমী অত্যন্ত আগ্রহভরে এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

শুরুতেই 'সওগত' সম্পাদক নাসিরউদ্দীন প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে সমবেত সুধীমণ্ডলিকে উদ্দেশ করে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ের একটি অত্যন্ত আনন্দঘন ও ব্যতিক্রমী উদাহরণ নিয়ে আজকের এই বিশেষ সংবর্ধনার অয়োজন। একজন মুসলিম নারী হয়ে ফজিলতুননেসাই সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলেত যাচ্ছেন, তাকে সংবর্ধনার জন্য মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, কবি-সাহিত্যক, শিল্পী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সমবেত হয়েছেন। আমরা আশা করবো ফজিলতুননেসার হাত ধরেই বাংলার মুসলিম নারীরা আরো ধাপে ধাপে এগিয়ে এসে আলোকিত সমাজ গঠনের মাধ্যমে বাংলার দঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে।

ব্যারিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, ফজিলতুননেসা ইতোমধ্যেই নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণ করেছেন। তাকে অভিবাদন জানাই। আমরা আশা করবো, ফজিলতুননেসা বিলেত থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের পর এসে তুরস্কের খালেদা এদিব খানমের মতো দেশের ও সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইনস্পেকটর মৌলবী আবদুল করিম অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সাথে বললেন, আজ পর্যন্ত বাংলার মুসলমান সমাজ থেকে এরূপ সম্বর্ধনা নিয়ে কোন মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলেত যাননি। নাসিরউদ্দীন সাহেবের এই প্রথম ও বিরাট আয়োজন সার্থক হবে যদি মেয়েদের শিক্ষার দিক থেকে মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূরীভূত হয়। সমাজের কঠোর অবরোধের যুগে এই অসম সাহসী মেয়েটির উচ্চশিক্ষা লাভের আগ্রহ দেখে মুগ্ধ সমগ্র সমাজ। তিনিই পারবেন এই

ইতিহাস এভাবেই নানা সম্ভার নিয়ে এগোতে থাকে পুরোনো ইতিহাস ভেঙে নতুন ইতিহাস গড়ার প্রত্যয় নিয়ে। এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই নতুন অধ্যায়ের সূচনা তৈরি হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ফজিলতুননেসা উত্তরসূরি মুসলিম মেয়েদের জন্য উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করেন

সমাজের সকল কুসংস্কার ও অনগ্রসরতাকে প্রতিহত করে প্রতিটি ঘরকে আলোকিত করে তুলতে।

সভায় মৌলবী মুজিবুর রহমান, ব্যরিস্টার এস ওয়াজেদ আলী, ডা. এন কে ব্রহ্মচারী, জনাব সি সি মিত্র, খান বাহাদুর আসাদুজ্জামান, সৈয়দ জালালউদ্দীন হাশেমী, ড. আর আহম্মদ এবং আরো বেশ কয়েকজন বক্তা ফজিলতুননেসার সাহস ও কৃতিত্বের প্রশংসা ও তার বিলেত যাত্রার সাফল্য কামনা করেন। ফজিলতুননেসা তাকে এরূপ সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন ও দোয়া প্রর্থনা করলেন। ভবিষ্যতে এ দেশের মেয়েদের শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে তার একনিষ্ঠ চিন্তা রয়েছে বলে তিনি জানালেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে কাজী নজরুল ইসলাম ফজিলতুননেসার বিলেতযাত্রা উপলক্ষে স্বরচিত একটি গান গেয়েছিলেন।

গানটি নিম্নরূপ:

“জাগিলে ‘পারুল’ কি গো ‘সাত ভাই চম্পা’ ডাকে
উদিলে চন্দ্র-লেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে।
চলিলে সাগর ঘুরে
অলকা মায়ার পুরে,
ফোটে ফুল নিত্য যেথায়
জীবনের ফুল্ল শাখে।
আঁধারের বাতায়নে চাহে আজ লক্ষ তারা.
জাগিছে বন্দিনীরা, টুটে ঐ বন্ধ কারা।
থেকো না স্বর্গে ভুলে
এ পারের মর্ত্য-কূলে,
ভিড়ায়ো সোনার তরী
আরো এই নদীর বাঁকে।”

কবি জসীমউদ্দীন সুদূর ফরিদপুর থেকে ফজিলতুননেসার বিলেত যাত্রা উপলক্ষে ‘বিদায় অভিনন্দন’ নামে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। পরের দিন এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সংবাদটি প্রায় সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিলো।

লেখক: সমাজকর্মী ও গবেষক

কবিকণ্ঠের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই

শ্যামল দত্ত

কবিকণ্ঠ-র তৃতীয় প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধান অতিথি সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানীসহ কবিকণ্ঠের সদস্যরা

'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' গানটি শুনলেই একের পর এক ছবি এসে যেন ভিড় করে চোখের সামনে। না, কফি হাউসের সেই আড্ডার ছবি নয়। আমাদের আড্ডার ছবি। মনে হয় এ আড্ডাতো আমাদেরও ছিল। একবারেই আমাদের নিজস্ব আড্ডা। কবিকণ্ঠের আড্ডা।

কবিতা চর্চার বোধহয় একটা বয়স থাকে, আর সে বয়সে সবাই হয়ে ওঠে কবি। বোধহয় সে রকমই একটা বয়সে আমাদের আড্ডাটা গড়ে উঠেছিল। কবিতার আড্ডা।

পাবনার মত একটি মফস্বল শহরে ১৯৭৮এর কোনো এক সময় এই আড্ডার জন্ম হয়েছিল। কোনো ঘটা কিংবা আড়ম্বরের মধ্যে নয়, নিছক আড্ডার মধ্যেই জন্ম হয়েছিল একটি কবিতা সংগঠনের। কবিকণ্ঠ। শহরের একমাত্র প্রধান সড়ক আবদুল হামিদ রোডের প্যারাডাইস রেস্টুরেন্টে চায়ের টেবিলে জন্ম হয়েছিল এ সংগঠনের। তারপর থেকে সপ্তাহের প্রতিটি শুক্রবার কবিকণ্ঠের স্বরচিত কবিতাপাঠের আসর বসেছে পাবনা তথ্যকেন্দ্রে। কখনও শহীদ বুলবুল কলেজের ছাত্রাবাসের সবুজ চত্বরে, ছাত্রাবাসের উন্মুক্ত ছাদে। আবার কখনো শহীদ আমিনউদ্দিন আইন কলেজের সিঁড়িতে অথবা তথ্যকেন্দ্রের উন্মুক্ত আঙিনা তথা মওলানা কসিমুদ্দীন আহমেদ স্মৃতিকেন্দ্রের মাঠে। শহরের নতুন ব্রিজের নিচে ইছামতির ধারে মওলানা কসিমুদ্দীন আহমেদ স্মৃতিকেন্দ্র–সেখানেই সে সময় জেলা তথ্যকেন্দ্রের অফিস। কবিকণ্ঠের আসর বসেছে বেশি এখানেই। এ আসরের অধিকাংশ সদস্যই সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্রছাত্রী। এছাড়া শহীদ বুলবুল কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী এমনকি অনেক পেশাজীবী ছিলেন কবিকণ্ঠের সক্রিয় কর্মী।

শহরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠক শ. ই শিবলীর নেতৃত্বে যারা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এই সংগঠনের সাথে, তাদের মধ্যে অনেকেই আজ কর্মজীবনের বৃহত্তর দায়িত্ব পালন করছেন দেশে অথবা দেশের বাইরে। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যাদের নাম, তারা হচ্ছেন–আতাহার আলী, আবু মহম্মদ রইস, মুহম্মদ রাশেদ, রুমী খোন্দকার, জাহাঙ্গীর উল হক, স ম সুবহানী বাবু, মুকুল আহমেদ, দীপকরঞ্জন চৌধুরী, সৈয়দ মোসতাফা আবর সতেজ, শফিকুল ইসলাম রিপন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল লী, সমজিৎ পাল, শুচি সৈয়দ, নূরুল হক সোজন, কামাল আহমেদ, খায়রুজ্জামান কামাল, মাসুদ শেখ কানু, সেলিনা খান শেলী, ফয়জুল ইসলাম সুমন, আবদুস সবুর খান হা-মীম, অমল সরকার, গোলাম মোরশেদ মানিক, আবদুল কুদ্দুস সাগর, আবদুদ দায়ন, আবদুল্লা হেল বাকি, রেজাউল করিম সাব্বির রেজা প্রমুখ।

আমরা কবিতার আসর করেছি পাবনা শহরের শতবর্ষ প্রাচীন অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরিতে, প্রেসক্লাবে, শহীদ মিনারের পাদদেশে, বুলবুল কলেজে, পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এবং আরও অনেক স্থানে। পাবনার বাইরে শাহজাদপুর রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে, শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে, সিরাজগঞ্জ কলেজে এবং রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলায়।

'কবিকণ্ঠে'র আড্ডাটা ছিল আসলে আলাদা এক ধরনের আড্ডা। স্বরচিত কবিতা পাঠ এবং আলোচনা এ আড্ডার মূল বিষয় হলেও কবিতা কিংবা আবৃত্তির ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার চেষ্টা ছিল সবসময়ই। অভিনয়, সঙ্গীত, আলেখ্য, শব্দানুষঙ্গ ইত্যাদির ব্যবহারে 'কবিকণ্ঠ' এক আলাদা নিয়মে কবিতা পরিবেশনের চেষ্টা শুরু করেছিল। 'কবিকণ্ঠ'র এই ব্যতিক্রমী চেষ্টায় শামিল হয়েছিলেন পাবনার বিভিন্ন সংগঠনের সংগীতশিল্পী, নাট্যশিল্পী এবং কলাকুশলী। এদের মধ্যে ছিলেন ভক্তিদাস চাকী, সুদীপ্তা রায় পুতুল, আবুল কাশেম, প্রলয় চাকী, মলয় চাকী, কাজী আবদুর রাজ্জাক, মিনতি

সান্যাল, সুলতান মুহাম্মদ রাজ্জাক, আমিনুর রহমান, কোবাদ আলী, মো. সোলেমান, এম এ মহসীন, পারভীন সুলতানা পাপড়ি, শিবানী নাগ, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, নন্দকিশোর, পল্লব সান্যাল, পরজ চৌধুরী, আবদুর রশিদ, রীতা বসাক, আবদুল কাদের মন্টু, ইসমাইল হোসেন মন্টু প্রমুখ।

মনে পড়ছে 'কবিকণ্ঠ'র প্রথম বর্ষপূর্তির উৎসবমুখর সেই সময়ের কথা। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে পাবনার অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে জাঁকজমকপূর্ণ এক বিশাল অনুষ্ঠানে উদযাপিত হয়েছিল বর্ষপূর্তি। পাবনা ছাড়াও সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং ঢাকা থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধি এসেছিলেন। এ প্রথম বর্ষপূর্তিতেই 'কবিকণ্ঠ' পরিবেশন করেছিল এক ব্যতিক্রমী কবিতা আলেখ্য : 'আমরা সুবর্ণগ্রামে যাবো'। পাবনায় অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরিতে যারা সেদিন অনুষ্ঠানটি দেখেছিলেন, বোধহয় আজও তারা মনে রেখেছেন সেদিনের কথা। কবিতার মতো একটি আবৃত্তিপ্রধান মাধ্যমকে অভিনয়, সংগীত, অভিব্যক্তি এবং সেই সাথে আলো আর শব্দের ব্যঞ্জনায় কত আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, মফস্বল শহরের কবিতাকর্মীরা সেদিন তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সেদিন তাদের কাছে সহজলভ্য ছিল না কিন্তু তাদের অন্তর ভরা ছিল সৃষ্টির এক নতুন আকাঙ্ক্ষায়।

'কবিকণ্ঠ'ই পাবনায় সর্বপ্রথম গুণীজন সংবর্ধনার প্রবর্তন করেছিল। সংবর্ধিত হয়েছিলেন পাবনার বিশিষ্ট কবি ওমর আলী এবং প্রবীণ নাট্যশিল্পী শ্রী তপনচন্দ্র লাহিড়ী।

প্রবীণ কণ্ঠশিল্পীদের নিয়ে সংগীতসন্ধ্যার আয়োজনও ছিল 'কবিকণ্ঠ'র নতুন এক উদ্যোগ। এ অনুষ্ঠানে পাবনার শ্রীমতী রেণু অধিকারী, শ্রীমতী রূপবাণী ঘোষ, মোজাম্মেল হোসেন, শ্রী শৈলেশ সান্যাল, দেলোয়ার হোসেন, শম্ভু জোয়ার্দারের মতো প্রবীণ শিল্পীরা অংশ নিয়েছিলেন। পাবনা প্রেসক্লাবের তৎকালীন স্বল্প-পরিসর মঞ্চে হলেও এই সঙ্গীত সন্ধ্যার সুর-মূর্ছনা পাবনাবাসীকে আলোড়িত করেছিল।

ছোটদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনও করেছে 'কবিকণ্ঠ' বিভিন্ন সময়। ছোটদের বিভিন্ন সংগঠন এ সময় 'কবিকণ্ঠ'র পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে পাবনা থিয়েটার '৭৭, অরণি, বনমালী ইনস্টিটিউট, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠি (পাবনা জেলা শাখা), ললিতকলা কেন্দ্র ইফা, কিশোর কুঁড়ির মেলা সবসময়ই 'কবিকণ্ঠ'র পাশে থেকেছে। বয়স্কদের মধ্যে যারা বিভিন্নভাবে 'কবিকণ্ঠ'কে সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন জাহেদী, অধ্যক্ষ এ আর শামসুল ইসলাম, অধ্যাপক শিবজিত নাগ, অধ্যাপক ফিরোজা বেগম, অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, অধ্যাপক খোন্দকার খালিকুজ্জামান, আনোয়ারুল হক, রবিউল ইসলাম রবি, আবদুল মতীন খান, রোখসানা ইসলাম, শ্রীমতী মীরা রায়, এডভোকেট খোরশেদ আলম এবং জি এস এম চিশতি প্রমুখ।

নিয়মিত কবিতাচর্চার পাশাপাশি প্রকাশনা ছিল 'কবিকণ্ঠ'র আরেকটি দিক। বিচ্ছিন্ন এবং অনিয়মিতভাবে হলেও 'কবিকণ্ঠ'র সদস্যরা বিভিন্ন সময় সাহিত্য সাময়িকী, লিটল ম্যাগাজিন ইত্যাদি বের করেছেন। আবার পাবনা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িকী প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাছাই করে 'কবিকণ্ঠ' শ্রেষ্ঠ গল্পকার, শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ নিবন্ধকার, শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদশিল্পী, শ্রেষ্ঠ সম্পাদক হিসেবে পুরস্কারও দিয়েছে। শুধু কবিতাকর্মী বা কবি গড়ে তোলা 'কবিকণ্ঠ'র লক্ষ্য ছিল না, সংস্কৃতির বিচিত্র ভুবনকে স্পর্শ করার সাহস সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য।

প্রথম বর্ষপূর্তিতে 'কবিকণ্ঠ' একটি ছোট্ট স্মারক প্রকাশ করেছিল। এর রচনা থেকে শুরু করে মুদ্রণের প্রায় প্রতিটি

দৈনিক বার্তা
পাবনার সাহিত্যাঙ্গনে একটি সৃজনশীল প্রয়াস—'কবিকণ্ঠ'

কবিকণ্ঠ-কে নিয়ে সে সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে

ক্ষেত্রে 'কবিকণ্ঠ'র সদস্যদের নিজের হাতের ছাপ রয়েছিল। আজ থেকে বিশ বছরেরও বেশি আগে পাবনার লেটার প্রেসে নিজেরা কম্পোজ করে, প্রুফ দেখে এবং ছাপার বাকি কাজ শেষ করে একটি সংকলন প্রকাশ খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু 'কবিকণ্ঠ'র কর্মীরা তা করেছেন। করেছেন আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে। সে সময় পাবনার একমাত্র অভিজাত প্রেস বাণীমুদ্রণ-এর স্বত্বাধিকারী ইয়াসিন আলী মৃধা রতন ছিলেন 'কবিকণ্ঠ'র অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। প্রেসের ম্যানেজার দেবদাস ঘোষকে অভিব্যক্তিতে আপাত-গম্ভীর মনে হলেও তিনি ছিলেন সকলের কাকাবাবু। 'কবিকণ্ঠ'র যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তার ছিল নীরব সমর্থন। একই রকম সমর্থন জুগিয়েছেন বুলবুল আর্ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী আব্দুল হাই। এদের অপরিশোধ্য সহযোগিতার ঋণ 'কবিকণ্ঠ'র কর্মীরা বহন করবেন আজীবন।

প্রথম বর্ষপূর্তি স্মারকে 'কবিকণ্ঠ'র সদস্যদের কবিতা নিয়ে একটি চমৎকার মূল্যায়নধর্মী নিরীক্ষা রচনা করেছিলেন অধ্যাপক আতাহার আলী। 'কবিকণ্ঠ'র তাত্ত্বিক সদস্য হিসেবে পরিচিত আতাহার আলী 'সাম্প্রতিক কবিতা : কবিকণ্ঠ' নিবন্ধে

কবিকণ্ঠ-র সদস্যদের সক্রিয় উদ্যোগেই পাবনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো সাপ্তাহিক বিবৃতি। এখন সেটি দৈনিক।

লিখেছিলেন, 'গত একটি বছরে কবিকণ্ঠ প্রায় তিন শতাধিক কবিতার জন্ম দিয়েছে। এই জন্মের পেছনে রয়েছে প্রায় চল্লিশজন লেখকের অবদান। আধুনিক তথা সাম্প্রতিক কবিতার জীবনপিপাসা অর্থাৎ কবিতার জীবন এবং তৎসম্পর্কিত মৌলিক সমস্যাবলী ও হৃদয়বৃত্তির মৌল আবেদনকে কবিকণ্ঠর কবিরা পাশ কাটিয়ে যায়নি। বরং গভীর প্রত্যয়ে তাকে আবাহন করেছে। তাদের দৃষ্টি প্রসারিত সামনের দিকে। তাই সাম্প্রতিক কবিতার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখতে তারা পারঙ্গম। তবে সঠিক বিচারের ভার আগামীকালের হাতেই রইল। আমরা শুধু এটুকু বলব যে, যেহেতু কাল এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে কবিতা এবং সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে কবিকণ্ঠ ও তার কবিতা। পথই তাদের পথ দেখাবে এই ভরসায় এগিয়ে যাবার বিরাম নেই তাদের। কবিকণ্ঠর সম্মিলিত প্রতীক উচ্চারণে একথা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে–

'ছুটেছে ঘোড়া রাজা জোড়া খুরের ধ্বনি,
পিঠের 'পরে চাবুক পড়ে শব্দ শুনি।
উর্ধ্বশ্বাসে এই বাতাসে উড়িয়ে কেশর
চলছে উড়ে অনেক দূরে আপন দেশ ওর।'

(এই চারটি পঙ্‌ক্তি রচনা করেছিলেন 'কবিকণ্ঠ'র তিন সতীর্থ: শুচি সৈয়দ, জাহাঙ্গীর-উল হক এবং শ্যামল দত্ত)।"

স্মৃতি সতত সুখের নয়, দুঃখেরও। 'কবিকণ্ঠ'র সেই সুখস্মৃতির সঙ্গে একটি গভীর কালো ক্ষত আজও আমাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে আছে। শোকাবহ সেই অধ্যায়টির নাম জাহাঙ্গীর-উল হক। 'কবিকণ্ঠ'র নীলকণ্ঠ বলে খ্যাত জাহাঙ্গীর এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে।

শুরু থেকেই 'কবিকণ্ঠ'র আড্ডা ছিল বিচিত্রমুখী। এসব আড্ডার আলোচনার বিষয় ছিল কখনও কবিতা, কখনও নাটক, কখনও সঙ্গীত, আবার কখনও প্রকাশনা। ছোটখাট প্রকাশনার পাশাপাশি একটি নিয়মিত সাপ্তাহিক প্রকাশেরও স্বপ্ন ছিল অনেকদিনের। সে স্বপ্ন পূরণও হয়েছিল। 'কবিকণ্ঠ'র কবিতা কর্মীদের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল 'সাপ্তাহিক বিবৃতি'। সম্পাদক শ. ই শিবলী এবং প্রকাশক ইয়াসিন আলী মৃধা রতন।

নিয়মিত প্রকাশনার মাত্র এক বছরের মধ্যেই সারা পাবনায় সাপ্তাহিক 'বিবৃতি' জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বেনিয়াপট্টিতে সাপ্তাহিক 'বিবৃতি'র নিজস্ব কার্যালয় ছিল তখন 'কবিকণ্ঠ'র নিয়মিত আড্ডা। এই আড্ডায় এসে যোগ দিয়েছেন শহরের প্রায় সব ক'টি সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পী-কর্মীরা। এভাবেই একটু একটু করে সম্প্রসারিত হয়েছে 'কবিকণ্ঠ'। বেড়েছে তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা। একসময় জাহাঙ্গীর-উল হকের নেতৃত্বে ঢাকায় এবং মহম্মদ রাশেদের নেতৃত্বে চট্টগ্রামেও কবিকণ্ঠর শাখা কার্যালয় গড়ে উঠেছিল। 'কবিকণ্ঠ'র চট্টগ্রাম শাখা মহম্মদ রাশেদের সম্পাদনায় প্রকাশ করেছিল একটি মনোরম সংকলন 'অবয়ব' নামে। ঢাকায় কবিকণ্ঠর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আসর সংগঠিত করেন প্রয়াত জাহাঙ্গীর-উল হক। মন্‌জু নুরুল আলম, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, মহম্মদ রাশেদসহ অনেকেই সে উদ্যোগে ছিলেন।

সবকিছু এত তাড়াতাড়ি স্মৃতি হয়ে যায়–ভাবতেও অবাক লাগে। মনে হয়, এইতো সেদিনের কথা। অথচ এরই মধ্যে পার হয়ে গেছে বিশটি বছর। একটি জীবন থেকে বিশটি বছর খসে যাওয়া কম নয়। এই বিশ বছরে পাবনা শহর অনেক বদলেছে। একাধিক দৈনিক পত্রিকা বের হচ্ছে এখন পাবনার মতো একটি মফস্বল শহর থেকে। সাপ্তাহিক বিবৃতি আজ দৈনিক। কিন্তু নেই 'কবিকণ্ঠ'। 'কবিকণ্ঠ'র সদস্যরা কে কোথায় কে জানে? মোস্তফা আরব সতেজ পাবনাতেই, সুবহানী বাবু একটি জাতীয় দৈনিকের জেলা সংবাদদাতা, সমজিৎ পাল দেশের বাইরে স্কলারশিপ নিয়ে পিএইচডি-র জন্য গবেষণা করছে ফিলিপাইনে। আবু মহম্মদ রইস ক্যাডেট কলেজে শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। রুমী খোন্দকর চাটমোহর কলেজে শিক্ষকতায়। আতাহার আলী ছিলেন শান্তাহার সরকারি কলেজে। দীপক রঞ্জন চৌধুরী শান্তি নিকেতন থেকে ফিরেছে কিনা কিংবা ফিরলে কোথায় আছে জানি না। জানি না কেমন আছে মাসুদ শেখ কানু, শ. ই রিপন, নূরুল হক সোজন।

শ. ই শিবলী পাবনায় আইন পেশায় যুক্ত ছিলেন। তিনি আজ নেই।

সেই আড্ডাটাও আজ আর নেই। আবদুল হামিদ রোডে প্যারাডাইস রেস্টুরেন্ট আছে আগের মতোই। আগের মতোই বেচাকেনা, হৈ-চৈ সব আছে। শুধু 'কবিকণ্ঠে'র ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই আড্ডাটা নেই। সেই আড্ডার কথা ভাবতে-ভাবতে আজ মনে হয়, জীবনের সোনালি দিনগুলো কি এভাবেই একদিন হারিয়ে যায়?

লেখক: চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক

বিজ্ঞানচর্চা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়

আলমগীর খান

বিজ্ঞানচর্চায় আমাদের দেশ বেশ পিছিয়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত। শুধু প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্যই যে এ চর্চা প্রয়োজন তা নয়। সামগ্রিকভাবে আমাদের ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মনমানসিকতায় আমূল পরিবর্তন এনে সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান মনস্কতা তৈরির জন্যও এটি প্রয়োজন। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জীবনযাপন ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমরা যেসব ধারণা বয়ে বেড়াই তার অনেক কিছুই সঠিক, আবার কিছু প্রশ্নবিদ্ধ ও কিছু ভ্রান্ত। তবে ভ্রান্ত ধারণাসমূহ আপনা আপনি সমাজ থেকে উবে যায় না, সেগুলোর অনেক শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক থাকে। সেজন্য দূর করা সহজ নয়।

সমাজে সব ধারণাকেই বিচারবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এ প্রক্রিয়া চলমান থাকে। কারণ সমাজ চলমান ও নিয়ত পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনের স্রোতে অনেক বদ্ধমূল ধারণা প্রায়ই ঝাঁকি খায়, মানুষ কর্তৃক গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে যায়। বিজ্ঞানের যুক্তি প্রক্রিয়া হচ্ছে সেই বিচার-বিশ্লেষণের হাতিয়ার ও গ্রহণ-বর্জনের ছাঁকনি। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সব বিষয়েই বিজ্ঞানের যুক্তি প্রক্রিয়ার একটা দৃঢ় স্থান আছে। তবে যুক্তি প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হবে তা নয়, কারণ যুক্তি হাতিয়ার মাত্র, শেষ কথা নয়। কিন্তু এ বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রক্রিয়ার হাতিয়ার ব্যবহারে প্রত্যেক সমাজসদস্যের কমবেশি কিছু দক্ষতা না থাকলে সামাজিক অগ্রগতি শ্লথ হতে বাধ্য।

সমাজে ও রাষ্ট্রে বিজ্ঞানচর্চার প্রসার সে কারণেই অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচার ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমেই বিজ্ঞানচর্চার কাঙ্ক্ষিত প্রসার হচ্ছে মনে করার কোনো সুযোগ নেই। শুধু এটুকুর মধ্যে বিজ্ঞানচর্চাকে সীমাবদ্ধ রাখলে সমাজের বৈষম্য ও বিভাজন আরও স্থায়ী ও দৃঢ় হয় মাত্র, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ও চিন্তার সুফলকে গণমানুষের হাতে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয় না। এ রকম বিজ্ঞান দেখে মনে হবে এ হচ্ছে চিন্তার সার্কাস যা সার্কাসওয়ালাদের মত কেবল বিশেষ প্রতিভাবানদের পক্ষেই অর্জন ও চর্চা করা সম্ভব, গণমানুষের সঙ্গে যা সম্পর্কহীন। অথচ প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চার সাফল্য হচ্ছে একে জনমানুষের জীবনচর্চার ও দৃষ্টিভঙ্গির অংশে পরিণত করা। এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা ও করণীয় কী কী ভেবে দেখা দরকার।

বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চার ঘাটতি ও দুর্বলতা নিয়ে প্রায়ই কথা শোনা যায়। শিক্ষার্থীদের আগ্রহের ঘাটতির কথা বলা হয়। বিজ্ঞানের দুরবস্থা নিয়ে কেউ কেউ দুঃখপ্রকাশ করেন ও স্বীকার করেন যে, এ ছাড়া দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব

> সবকালেই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও আবিষ্কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের চালিকাশক্তি। অন্যদিকে বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবিক বিদ্যার সম্পর্ককে প্রায়ই বিবেচনার মধ্যে আনা হয় না

নয়। এসব যারা বলেন তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচার ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির কথাই ভাবেন। তাই তাদের বক্তব্য আংশিক সত্য।

সাধারণত চিকিৎসা, প্রকৌশলবিদ্যা, কম্পিউটার-বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে পড়ালেখা করাকেই বিজ্ঞানশিক্ষা মনে করা হয়। গভীরভাবে দেখলে, এসব পড়ালেখার উদ্দেশ্য কী? অভিভাবকরা চান ছেলেমেয়ে এসব বিষয়ে পড়ালেখা করে 'বড় মানুষ' বা বড়লোক হোক। এই চাওয়ার কারণ এ নয় যে, বিজ্ঞানের প্রতি তাদের অগাধ অনুরাগ, আসল কারণ এসব বিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে আর্থিকভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের নিশ্চয়তা। এসব বিদ্যা পছন্দ ও নির্বাচনের পিছনে আর্থিক স্বার্থচিন্তাই মূল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সে তুলনায় খুবই কম। উল্লেখ্য, এদেশে 'বড়লোক' কথাটার প্রচলিত মানে অনেক টাকার মালিক, সত্যিকার বড় মনের মানুষ নয়।

অভিভাবকদের জন্য এটি দোষের কিছু নয়, বরং সন্তানের জীবনে আর্থিক সাফল্যের আকাঙ্ক্ষাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভূমিকাও মোটামুটি এর মাঝেই সীমাবদ্ধ, মৌলিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনের জন্য এখানে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রণোদনা নেই। ব্যক্তির পেশাগত আয় বৃদ্ধির বাইরে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও দর্শনের আর কোনো ভূমিকা গুরুত্ব পায় না। বিজ্ঞান এখানে একদিকে কুয়ার ব্যাঙের মতো ও অন্যদিকে একটি ব্যবসায়িক শাস্ত্র মাত্র।

বিজ্ঞানচর্চার এই ব্যবসায়িক চরিত্রলাভের সঙ্গে বাণিজ্যক্ষেত্রের সম্পর্কটি স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে সে বাণিজ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ের। রাষ্ট্রীয় মৌলিক ও বৃহৎ অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্ক সামান্য। অথচ সবকালেই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও আবিষ্কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের চালিকাশক্তি। অন্যদিকে বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবিক বিদ্যার সম্পর্ককে প্রায়ই বিবেচনার

মধ্যে আনা হয় না। অনেকেই জ্ঞানের দুই ধারাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখেন। আবার স্কুল-কলেজে ভাল ফল অর্জনকারী ছেলেমেয়েকে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করানোর আগ্রহ থেকে মনে হয়, মানবিক বিদ্যাটি বিজ্ঞানের মতো আশরাফ নয়। অভিভাবক সমাজের মনে বিদ্যা নিয়ে প্রচলিত আশরাফ-আতরাফের এই বিভাজন যেমন আমাদের সমাজকে, তেমনি জ্ঞানচর্চাকেও ভয়ানক পিছিয়ে রেখেছে। এর ফলে বিজ্ঞান এ দেশে একটি ব্যবসায়িক বিদ্যা হিসেবে বেশি পরিচিত ও চর্চিত।

কেন এমন হচ্ছে? কারণ প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চা কোনো স্বাধীন বিষয় নয়, পুরোটাই একটি রাষ্ট্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশমাত্র। শুধু বিচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞানচর্চার জন্য কান্না তাই মেকি ও নিষ্ফল। বৃহত্তর দৃষ্টিতে সকল জ্ঞান ও শাস্ত্রই মানবিক দর্শনবিদ্যার অন্তর্গত। ভুল হবে বিজ্ঞানকে এক বৃহত্তর রাজনৈতিক-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে না দেখে একে বিচ্ছিন্ন একটি মেধার কসরৎ হিসেবে দেখলে। সেই ভুলই হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে। এ প্রসঙ্গে মনে আনা যেতে পারে ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের চাঁদে মানুষ পাঠানোর অভিযানের কথা, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টার ফলও। আর ইউরোপিয়ান বিজ্ঞানের যা কিছু অর্জন তার সবই পুঁজিবাদের অব্যাহত আগ্রগতির চালক ও অংশ। পশ্চাৎপদ, পরাধীন ও ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক দেশে তাই বিজ্ঞানচর্চাও ভয়ানক পিছিয়ে।

বিজ্ঞানী কেবল তাই ব্যক্তির মাথার জোরে পয়দা হয় না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্মের জন্য জাতীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক উর্বর ভূমি প্রয়োজন। আলবার্ট আইনস্টাইনরা পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের পশ্চাৎপদ দেশগুলিতেও জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তারা বিকাশের উপযুক্ত জমি পান না, তাই অপুষ্টির শিকার হয়ে বা বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে বা কারণে-অকারণে নিহত হয়ে হারিয়ে যান। বিজ্ঞানকে সামগ্রিক জাতীয় অবস্থা ও বৃহত্তর জ্ঞানচর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিছক মেধার জিমন্যাস্টিকস হিসেবে দেখা হলে বিজ্ঞাচর্চার জন্য আমরা আরও শত বছর ধরে কুমিরের কান্নার সুযোগ পাবো, কিছুই ফল হবে না।

মানতেই হবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চা ও তার প্রসার জরুরি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা ও গণতান্ত্রিকতা সবার অগ্রগতির জন্য অপিরহার্য। বিজ্ঞান, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, নীতিবিদ্যা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যার যার মতো আলাদা পথে হাঁটে না। দৃঢ়ভাবে বলা যায়, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র ও সাহিত্য-সংস্কৃতি একাত্ম। বিজ্ঞানচর্চা প্রসারের প্রয়োজন তাই কেবল বিজ্ঞানের স্বার্থে নয়, সকলের স্বার্থে। আবার সম্প্রসারিত বিজ্ঞানচর্চার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অনুকূল পরিবেশ তৈরিও অতীব জরুরি।

প্রথম কবিতা

ক্যাডেট শফিউল

আমার জীবনের প্রথম কবিতা লেখা
এ যেন নেহায়েত কোন সুখ স্বপ্ন দেখা।
কবিদের কবিতা পড়ে হয়েছি কতো মুগ্ধ
হারিয়ে গিয়েছি ভাবনার জগতে
শ্বাস হয়েছে রুদ্ধ।
ছন্দ মেলানো সোজা কতো,
কবিতা পড়ে তাই মনে হতো।
ভাবলাম হয়ে যাই কবি
লিখতে গিয়ে কবিতা ভুলতে হলো সবই,
ছন্দ মেলাতে হতে হয় কত দক্ষ।
তবুও কবিতা লিখব, কবি হওয়াটাই আমার লক্ষ্য;
অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ছন্দের পাইনি দেখা।
ছন্দ যেন বন্ধ ঘরে লুকিয়ে আছে একা
সেই ঘরের চাবি যেন আছে শুধু কবিদের কাছে
আমার মতো কবিরা পড়ে থাকে পাছে
তবুও চেষ্টার কি আছে কোন শেষ?
মানুষ যেমন চেষ্টা করেছে মহাশূন্যে ওড়ার
আমিও তেমনি চেষ্টা করেছি ছন্দকে ধরার
সেই চেষ্টারই প্রথম ফসল, আমার প্রথম কবিতা লেখা
মনে মনে নিজেকে কবিদের পাশে দেখা।

মোঃ শফিউল আলম সিলেট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র, জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ২০০৪ সালে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ২০ দিন আগে ৪ মে তার মৃত্যু হয়। তার ডায়েরিতে কবিতাটি পান তার বড় ভাই সিদীপের কর্মী মাহবুব উল আলম।

মূল্যবোধ শিক্ষা

পপি খাতুন

খাদ্য ও আশ্রয়ের মতোই মানুষের এক মৌলিক অধিকার হচ্ছে শিক্ষা লাভের অধিকার। মানবাধিকারের ওপর ১৯৪৮ সালের বিখ্যাত বৈশ্বিক ঘোষণার ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই রয়েছে শিক্ষা লাভের অধিকার। শিক্ষা শুধু অধিকারই নয়, মানব উন্নয়নের ছাড়পত্রও। শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে অ্যারিস্টোটল বলেছেন, "একজন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু, যতটুকু পার্থক্য একজন জীবিত ও মৃত মানুষের মধ্যে।"

জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং দারিদ্র্য হ্রাসে শিক্ষার গুরুত্ব অসামান্য–একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে কোন ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষিত মানুষ অশিক্ষিত যে কারো চেয়ে বহুগুণ দক্ষ। শিক্ষা মানুষের চোখ খুলে দেয় ও দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়। অন্যদিকে ঝলমলে আলোতেও মানুষকে অন্ধ করে রাখে অশিক্ষা। ভিক্টর হুগো তাই যথার্থই বলেছেন, "যে একটি স্কুলের দরজা খোলে সে একটি কারাগারের দরজা বন্ধ করে দেয়।"

সামাজিক পরিবর্তনের একটি বিশেষ উপাদান হলো শিক্ষা। শিক্ষা হলো এক ধরনের সংস্কার সাধন ও বিরামহীন প্রক্রিয়া। সমাজের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আত্মবিশ্বাস ও বিচার বিবেচনার ক্ষমতা জাগ্রত করে। শিক্ষা যাবতীয় অন্ধত্ব, অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সমাজে নারী শিক্ষার প্রসারে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। বহু সামাজিক নীতি ও আইন যেমন যৌতুকবিরোধি আইন, পারিবারিক আইন, নারী উন্নয়ন নীতি প্রভৃতি সামাজিক সচেতনতার ফসল। নারীশিক্ষা নারীকে কর্মমুখী করেছে। এতে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে। এভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা প্রভৃতি সমাজে পরিবর্তন এনেছে।

মূল্যবোধ তৈরি মূলত পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকেই শুরু হয়ে থাকে। কারণ পরিবার এমন একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান যা শিশুর জীবনের সূচনালগ্নেই তার চেতনায় এমন বোধ বপন করে দিতে পারে যা দীর্ঘস্থায়ী। তাই পরিবারকেই মূল্যবোধ তৈরির সূতিকাগার বলা যেতে পারে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, শিশু জন্ম নেওয়ার আগে থেকেই বাবা-মাকে তার পরিচর্যা ও প্রতিপালনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। পরিবার একটি শিশুর প্রথম দেখা জগৎ। সেখানে বসবাসকারী সদস্যদের চারিত্রিক আচরণ বিধি, আদর্শ, চলন-বলন ইত্যাদি শিশুর চরিত্র গঠনে সচেতন বা অসচেতনভাবে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

পরিবারের পরই শিশুকে পাঠাতে হয় বিদ্যাশিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তাই বলা যায় বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশুর জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান। একটি সমাজকে সাবলীল, মর্যাদাপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করার জন্য একটি সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন রয়েছে, আর বিদ্যালয়ের ওপরই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি বর্তায়। বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীকে সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলা, গুরুজনকে মান্য করা, নৈতিকতা, ন্যায্যতা, সহনশীলতা, মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য, অন্যের উপকার করা, বন্ধুদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা, নিজেদের সংস্কৃতিকে সম্মান করা ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। সাধারণত লক্ষ্য করা গেছে, ছাত্রছাত্রীর মনোজগতে পরিবারের আপনজনের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি একটা বড় আকর্ষণ জন্মায় এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাত্রছাত্রীকে প্রভাবিত করে। শিশুরা নিজ পরিবারের অথবা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কারো ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষিত হয়ে তাকে "রোল মডেল" হিসেবে বিবেচনা করে এবং তার আচরণকে মেনে চলার চেষ্টা করে।

মূল্যবোধ শিক্ষার দ্বারা মানুষ যেমন সচেতন ব্যক্তি হয়ে নিজেকে আলোকিত মানুষ হিসেবে তৈরি করতে পারে, তেমনি সে সমাজকে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা অর্জন করে। মূল্যবোধ শিক্ষার মূল বিষয়ই হচ্ছে নৈতিকতা উন্নয়নের শিক্ষা ও নাগরিকতার শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোনো উন্নতি সম্ভব নয়। তাই সমাজের জন্য শিক্ষার আলো দরকার। বালক-বালিকা, সকল শিক্ষার্থীদের তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। নইলে জাতি আশার আলো দেখতে সমর্থ হবে না।

লেখক: শিক্ষা সুপারভাইজার, সিদীপের চাটমোহর বালুচর শাখা, পাবনা

পড়ালেখার বাইরেও শিশুর মেধা বিকাশের সুযোগ তৈরি করতে হবে

অলোক আচার্য

শিশু বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে অভিভাবকের মাথায় দুশ্চিন্তা থাকে যে তার সন্তান বড় হয়ে কি হতে চায়। এই চিন্তা আসে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে। প্রতিটি শিশুকে নিয়েই তার পরিবার স্বপ্ন দেখে। তারা ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। তার ভবিষ্যৎ নিরাপদ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। এটা পরিবারের দায়িত্ব। আর এক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে ভাবনা প্রথমেই মাথায় আসে তা হলো তার সন্তানকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করা অথবা অন্য কোনো বড় সরকারি চাকরিজীবী করা। এখনো অনেকে মনে করেন যে লেখাপড়া করে সন্তান চাকরি করবে। এই ইচ্ছা মনে পোষণ করার অর্থ সন্তানের ভবিষ্যৎ যেন সুখের হয়, শান্তির হয় এই চিন্তা। এটাও স্বাভাবিক। তবে আজকাল অনেক সন্তান বড় হয় তার পরিবারের ইচ্ছার কথা মাথায় রেখে। তার যদি বিজ্ঞান বিভাগ পড়তে ভালো নাও লাগে তাহলেও তাকে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়তে হচ্ছে। এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে। কারণ বিজ্ঞান না পড়লে তো ডাক্তার হওয়া যাবে না। ভালো ছাত্র হওয়ার অর্থ হলো তাকে গণিত ও ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে। দুর্বল হলেই তাকে ভালো বলা যাবে না। আবার কোনো শিশু যদি গণিত ও ইংরেজি বাদে বাংলা বা অন্য বিষয়ে ভালো নম্বর পায় তাহলেও তাকে ভালো ছাত্র বলা হয় না। অথচ সে একজন সমাজ বিজ্ঞানী হতে পারে, সেই শিশুটি ভালো একজন লেখক, কবি, শিক্ষক বা এরকম কতকিছুই হতে পারতো। আবার সে ভালো ব্যবসায়ীও হতে পারতো। সে ভালো উদ্যোক্তা হতে পারে।

ভালো ছাত্র বা খারাপ ছাত্র নির্ধারণের বিষয়টি বিষয়ভিত্তিক হচ্ছে। তার মেধার বিষয়টিও সীমাবদ্ধ হয়েছে সেখানেই। কিন্তু যে শিশুটি স্কুলে ভালো দৌড় দিয়ে প্রথম হয়ে প্রতি বছর পুরস্কার আনছে সে যদি লেখাপড়ায় একটু দুর্বল হয় তাহলে তাকে মেধাবী বলতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে!

মেধা বিষয়টিই আমরা ভুল বুঝতে শুরু করেছি। মেধা বলতে কেবল একাডেমিক দক্ষতাকে বুঝছি। কতজন অভিভাবক রয়েছেন যারা সন্তান কি হতে চায় বা সে কি করতে চায় অথবা কোন বিষয়টি সে সবচেয়ে ভালো বোঝে বা কোনটায় দক্ষ সেটা মাথায় রেখে পরিকল্পনা সাজান? এটা পরিবেশ এবং পরিস্থিতির ওপর অনেকটা নির্ভর করে। কারণ সবার আগে জীবিকার নিরাপত্তা।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রাথমিক শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় শিশুর মেধার বিকাশ ঘটতে থাকে। বিভিন্ন সময় বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দেখা যায়, কোনো শিশু খুব ভালো দৌড়ায়, কোনো শিশু খুব ভালো লাফ দেয়, কোনো শিশু খুব ভালো ছবি আঁকে, কোনো শিশু ভালো নাচতে পারে বা গান গায় বা আবৃত্তি করতে পারে। এরকম আরও বহুমুখী প্রতিভার শিশু দেখা যায়। আজ পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। কেবল সার্টিফিকেটের বিদ্যা দিয়ে একটি নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হলেও এসব প্রতিভা জন্মগত। এই প্রতিভাকে লালন করতে পারলে লাভ সমাজের, দেশের, এমনকি পৃথিবীর। আজ যেসব ফুটবল খেলোয়াড় মাঠ মাতাচ্ছে, যাদের খেলা দেখে আমরা মুগ্ধ হচ্ছি তাদের অনেকেই উঠে এসেছে তৃণমূল পর্যায় থেকে। তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। কিন্তু তারা মেধার প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

যে ছেলেটি ভালো ফুটবল বা ক্রিকেট খেলতে পারে তাকে যদি সুযোগ দেওয়া হয়, সেও আমাদের জন্য সুনাম বয়ে আনতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে কত মেধা যে এভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় তার খোঁজ কে রাখছে? অথচ আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মেধা শব্দের অর্থ কেবল লেখাপড়ায় ভালো করা-ভালো ফলাফল করা। আর সবশেষে একটা ভালো চাকরি জোগাড় করা। একজন যদি ভালো কবিতা লিখতে পারে অথবা যদি তার গদ্যের হাত খুব ভালো হয় কিন্তু সে যদি কোনো চাকরি না পায় অথবা তার একাডেমিক রেজাল্ট ভালো না হয় তাহলে আমাদের সমাজে তাকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ সহ্য করতে হয়। সেই ব্যঙ্গবিদ্রুপ সবার পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। যদি কেউ সাহসের সাথে সমাজকে মোকাবিলা করে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তাহলে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

পরিবারেও তাকে এই নিয়ে কটুক্তি শুনতে হয়। সে তার মেধার মূল অংশ বাদ দেয় এবং আপ্রাণ চেষ্টা করে একটা চাকরি জোগাড়ের। এখানে পরিবারের আর্থিক মুক্তির বিষয়টিও থাকে। কারণ সন্তান বড় হয়ে চাকরি করে সংসারের হাল ধরবে এমন প্রত্যাশাই থাকে সবার। আর সেটা না হলে আশা ভঙ্গ তো হবেই। অথচ সন্তানের আশা ভঙ্গ হওয়া বা না হওয়াতে তেমন কিছু যায় আসে না! শিশুর মেধার বিষয়টি অভিভাবককে খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করতে হবে। সে কি করতে চায়, কিভাবে করতে চায়, তার ভেতর বিশেষ কোন গুণটি জীবনে পেশায় রূপ দেওয়া সম্ভব তা খুঁজে বের করতে হবে।

প্রত্যেককেই পড়ালেখা শিখতে হবে। সে গায়ক হোক, খেলোয়াড় হোক বা অন্য যেকোনো পেশাই হোক। তবে যদি তার বিশেষ দক্ষতা তার ভবিষ্যৎ পেশায় পরিণত হয় তাহলে তা হয় তার জন্য প্রশান্তির। অর্থাৎ একজন ছোটবেলা থেকেই যদি গান ভালোবাসে, সে যদি ভালো গান গাইতে পারে এবং ভবিষ্যতে যদি প্রতিষ্ঠিত গায়ক হয় তাহলে সেটা তার জন্য আনন্দদায়ক। দেশের জন্যও মঙ্গল। বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ আমাদের প্রয়োজন। আমাদের দক্ষ মানুষ প্রয়োজন। সন্তান বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথেই তার বিশেষ গুণগুলো বিকশিত হতে আরম্ভ করে। আবার তার দুর্বল দিকগুলোও প্রকাশ পায়। তার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টিও খুব ভালোভাবেই বোঝা যায়। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে তাকে তৈরি করতে পারলে শিশুর মেধার প্রকৃত সম্ভাবনা খুঁজে বের করা সম্ভব হয়।

লেখক: শিক্ষক ও কলামিস্ট

বড় দেরি হয়ে গেল

তোফায়েল আহমেদ

আজ বাগানে কিংবা বাজারে কোথাও কোন গোলাপ নেই
অন্তরাত্মার শেষ ক'টি গোলাপের পাপড়ি
ছড়িয়ে রেখে এলাম এক নীল বেনারসির ভাঁজে।
যে বেনারসি কখনও পরা হবে না, ছোঁবেও না হয়তো কেউ;
যে পাপড়ি কালের স্রোতে মিশে যাবে বেনারসির ভাঁজে;
নীল বেনারসি একদিন মিলিয়ে যাবে প্রকৃতির অন্তহীন গভীরে।
বড় দেরি হয়ে গেলো তোমার কাছে পৌঁছাতে,
বড় দেরি হয়ে গেলো তোমাকে বুঝতে "মা"।
মা– আজ তোমার দিন,
দ্যাখো কতো গোলাপ আজ হৃদয়ের মণিকোঠায় চোখের তারায়;
তবু তুমি নেই এই চোখের সীমানায়;
সারা পৃথিবীর সব জীবন্ত গোলাপ যদিও আমার কাছে অর্থহীন-পরিত্যক্ত।
আমার হৃৎপিণ্ডের অব্যক্ত যন্ত্রণার রক্তাক্ত গোলাপ
তোমার সমাধিতে নিবেদন করলাম 'মা'।
ভাগ্যবানদের গোলাপ মায়ের হাতে
দুর্ভাগা রেখে যাবে সমাধি পাশে।

ঐশ্বরিক অজ্ঞাত এক মহা অন্ধকার জগৎ থেকে জনক-জননীর ঔরসে,
জমাট রক্তবিন্দু থেকে মাংসপিণ্ড; মহাসৃষ্টির মহাবিস্ময়।
প্রাণসঞ্চারিণী অলৌকিক কারখানা, দুর্ভেদ্য দুর্গ এই মাতৃগর্ভ!
জাতক-জাতিকার অপার্থিব আবাস
এক মুখে দোহের আহার, একশ্বাসে দুজনের শ্বাস।
জঠরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা অচেনা ধরার ধূসর জমিনে,
দু'খানা হাতের মায়ায় অসহায় মানবজীবন ওঠে দুলে;
একখানা মুখ অতি পরিচিত একান্ত আপন,
কাতরাতে কাতরাতে বুকের উষ্ণতায় আশ্রয় একান্ত স্বজন।
পৃথিবীর প্রথম আহার– মায়ের আঁচলতলে রবের দান;
ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগবালাই, রাগ-বিরাগের একই বিধান,
অনাদি-আদিম এই একটি দান।

প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি দিন
প্রতিটি রক্ত কণিকা এক-একটি ঋণ,
পায়ের নখ থেকে মাথার চুল, চোখের দৃষ্টি, শ্বাস-প্রশ্বাস, মস্তিষ্কের মেমব্রেন,
শিরদাঁড়া, দাঁতের সারি, জিহ্বার স্বাদ, কপালের ভ্রু, মাথার সিঁথি;
কার যত্নে কার ত্যাগে বেড়ে ওঠে নিতি!
ভাবিনিতো একবারও সারাজীবন জুড়ে,
নিজের জীবনতো কেটে গেল মহা একঘোরে
নিজের সন্তান দেখেও ভাঙ্গেনি সে মায়াঘোর।
নিজের কন্যা যখন হলো 'মা', যখন জীবন সংশয় হলো তার;
তখনই মনে হলো– এ কষ্ট আমার নিজের মায়ের,
এ কষ্ট আমার কন্যার মায়ের, এ কষ্ট যে আমারও।
গর্ভ আর প্রসবের সকল ত্যাগ-তিতিক্ষার ফসল যে আমিও।
আমিও ডুবে ডুবে ভাসি তাবৎ দুনিয়ার
জায়া-জননী-ভগিনির কষ্ট-স্রোতে একাকার।
আজ আমার তৃতীয় প্রজন্ম– পৌত্র-পৌত্রি বুকে নিয়ে ভাবি,
নিজের উদাসীন বেজন্মা জীবনের এত ঋণ কীভাবে হবে শোধ?
শোধরানোর সব পথ হয়ে গেছে রুদ্ধ,
এখন 'মা-দিবস' ক'টি ব্যর্থ গোলাপ পাপড়ির দ্বৈরথ!
এত সহজ কথাটি বুঝতে হলো এত দেরি আমার!

আজ জীবনের শেষ বিকেল, তোমার স্মরণ নিলাম।
হে আমার এবং আমার মায়ের প্রতিপালক, খালেক-মালিক-রহমান
মায়ের আত্মার শান্তি রেখো নিরন্তর বহমান।
তোমার কাছেই সমর্পিত তোমারই সৃষ্ট ধন,
অযত্ন অবহেলায় সাঙ্গ যার এ পৃথিবীর বেদনার্ত জীবন।
পরকালে পরম যত্নে রেখো তাকে,
শিশুকালে যে যত্নে রেখেছিলো 'মা' আমাকে।

আমার শখ বই পড়া

কাকলী খাতুন

আমার প্রিয় শখ বই পড়া। বই মানুষের মধ্যে জ্ঞানের সন্ধান করে। ভালো বই জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার। যার কাছে চাবি আছে সেই এ সকল ভাণ্ডারে প্রবেশে করতে পারে ও নিজেকে সাহায্য করতে পারে। চাবিটি কি? কেবল পড়ার সামর্থ্য। যে পড়তে পারে সে পৃথিবীর মহান চিন্তাবিদগণের মহান ভাবনায় মন পরিপূর্ণ করতে পারে। যে মানুষ কখনো বই খোলে না, তার মন শূন্য।

আমাদের চারপাশে রয়েছে বিচিত্র স্বাদের বিচিত্র বই । উপন্যাস, নাটক, গল্প, ইতিহাস, সাহিত্য , দর্শন, ভূগোল, আইন প্রভৃতি বিষয়ের বই থেকে মানুষ লাভ করে আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞান। একেক ধরনের বই মানুষকে একেক ধরনের আনন্দ দিয়ে থাকে। বই সব সময় পাশে থাকবে।

বই পড়লে আমরা কেবল নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি না, পাই নির্মল আনন্দ। কবি ওমর খৈয়াম দুঃখকষ্টময় বাস্তব সংসারে নিষ্কলুষ আনন্দের রোমান্টিক পরিবেশ কল্পনা করেছেন। তার সেই কাল্পনিক জগতে রয়েছে প্রেয়সী, রুটি, নির্জন বনভূমি এবং একটি সুন্দর গ্রন্থ।

সুষম খাদ্য যেমন মানুষের স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটায়, তেমনি তার চিন্তার বিকাশ ঘটায় বই। মানুষের প্রকৃত মুক্তি তার বৃদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে ও মানসিক উদারতায়। গত শতাব্দীর শুরুতে 'শিখা' নামক সাড়া জাগানো পত্রিকার শীর্ষে ছাপা হতো "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।"

বেঁচে থাকার স্বার্থেই মানবজীবনে আনন্দ প্রয়োজন। কিন্তু সংসারে নিঃস্বার্থ এবং নিষ্কলুষ আনন্দ পাওয়া বড় কঠিন। আমরা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করি, তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করি ও ধর্মকর্ম পালন করি। ছবি এঁকে, কবিতা লিখে ও গান গেয়ে আনন্দ লাভ করতে পারি। তবে এসবের মাঝে বই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের মাধ্যম।

সুষম খাদ্য যেমন মানুষের স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটায়, তেমনি তার চিন্তার বিকাশ ঘটায় বই। মানুষের প্রকৃত মুক্তি তার বৃদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে ও মানসিক উদারতায়

যে মানুষ বই পড়ে সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুরে মুক্তকণ্ঠে বলতে পারে: "যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ।" বই পড়ার পক্ষে প্রমথ চৌধুরী অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের ওপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, সে দুই-ই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ পেটের দায়ে।"

সবশেষে বলি, মানুষের অনেক আনন্দের মাঝে বই পড়ার আনন্দ সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ বই মানুষকে নরকের প্রজ্বলিত আগুনের মাঝে ফুলের হাসি ফোটানোর দুঃসাহস দান করে।

লেখক: শিক্ষা সুপারভাইজার, দেবোত্তর ব্রাঞ্চ, সিদীপ

স্বরূপ

গোলাম কুদ্দুস চঞ্চল
নির্বাহী সম্পাদক, ঝুনঝুনি

চণ্ডাল হতে হতে
কখন যেন ভদ্রবেশী
মনুষ্য হলাম
মুখোশ হটিয়ে দেখি
স্বরূপেই আছি সেই
জো-হুকুম গোলাম।
গোলামের নাক যত হোক খাড়া
রাজা বলে দাঁড়া একি হলো ফাঁড়া
এ তো দেখি যম-ভোঁতা
আমি শালা কালা গতরেতে জ্বালা
রাজবুলি বলা নেই ছলাকলা
নপুংসক পোষা তোতা।
আমি মেকি কাগজের বুলবুলি
আঙুলের ইশারায় চোখ তুলি
কর্তার ইচ্ছেতে নাচি
আমিত্বকে দিয়ে জলাঞ্জলি
তাবত ইচ্ছেদের দিই পাঁঠাবলি
নতজানু, স্বরূপেই আছি।

ভয় করি না

বিদ্যুৎ কুমার রায়

আমি তখন ভাসানটেক সরকারি কলেজের শিক্ষক হিসেবে নতুন নিয়োগ পেয়েছি। মো. আব্দুস ছামাদ স্যার কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেছেন। কলেজের অফিসের জন্য আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে মাত্র একজন নাইট গার্ড নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। সমস্যা হলো খালের মধ্যে কলেজ। কোন রাস্তা নেই। যদিও আমি নিজের বেতনের টাকা খরচ করে ছাত্রদের সাথে নিয়ে মাথায় করে মাটি নিয়ে নিয়ে রাস্তা তৈরি করেছি। সরকার এই রাস্তা করলে হয়ত ১০/২০ লক্ষ টাকা লাগত। আমি শুধু বেতনের ৫০/৬০ হাজার টাকা খরচ করে ৪/৫ মাসের মধ্যেই এই রাস্তা ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের চলাচলের উপযোগী করে ফেলেছি।

ভাসানটেক পুনর্বাসন প্রকল্পের মধ্যেই ছিল কয়েকজন সন্ত্রাসীর বসবাস। রেগুলার তাদের বাহিনীর লোকজন কলেজে আসত। আমি আর অধ্যক্ষ স্যার কলেজে থাকি। একদিন রাতে দেখি কলেজ বিল্ডিংয়ের পাশে একদল লোক (২৫/৩০ বছর বয়সী হবে) জুয়া খেলছে, গাঁজা খাচ্ছে। আমি সেখানে একাই গেলাম এবং তাদেরকে অনুরোধ করলাম কলেজ থেকে চলে যাবার জন্য। তারা চলে গেল। পরের দিন ক্লাস শেষে বিকেলে অধ্যক্ষ স্যারের রুমে বসে আছি। হঠাৎ বিশ বছর বয়সী একজন বিশাল একটা লম্বা রামদা নিয়ে অধ্যক্ষ স্যারের রুমে আমার সামনে আসলো। লোকটা আমাকেই বলল, বিদ্যুৎ স্যার কে? আমি ভয় পাচ্ছিলাম এই জন্য যে কথা বলার আগেই আমাকে জবাই করে কিনা! আমি বললাম, বসেন। লোকটা বসল। আমি বললাম, আমি বিদ্যুৎ স্যার। লোকটা আমাকে বলল, আপনি কাল খেলা বন্ধ করেছেন কেন? আপনাকে যদি কেটে ফেলি কে বাঁচাবে?

আমি বললাম, দেখুন আমাকে মারলে আপনার কোন লাভ নেই। বরং যে কাজ করলে আপনার লাভ হবে, সেটা আমি করতে পারি। লোকটা বলল, আমার লাভ হবে মানে? আমি বললাম, দেখুন আপনি সাহসী মানুষ। বাংলাদেশে সাহসী মানুষের খুব অভাব। আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি যদি উদ্যোগ নেন, তাহলে আপনি ভাসানটেক সরকারি কলেজকে দেশের সেরা কলেজে পরিণত করতে পারেন। আপনার কারণে কলেজে কোন দল থাকবে না। কেউ আধিপত্য দেখাবে না। কাল সকালে আপনি আসবেন।

আমি শুধু বেতনের ৫০/৬০ হাজার টাকা খরচ করে ৪/৫ মাসের মধ্যেই এই রাস্তা ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের চলাচলের উপযোগী করে ফেলেছি

আমি আপনাকে সবগুলো ক্লাসে নিয়ে সকল ছাত্রছাত্রীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিব এবং বলব আপনিই কলেজের আশেপাশের সকল ধরনের খারাপ কাজ থেকে কলেজকে মুক্ত করেছেন। সকল ছাত্রছাত্রী আপনাকে মন থেকে দোয়া করবে, সম্মান করবে। পরের দিন লোকটা এসেছিল। আমি ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে লোকটাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর থেকে ভাসানটেক সরকারি কলেজের আশেপাশে কোন খারাপ কাজ যেমন জুয়াখেলা, 'ডাল' খাওয়া, গাঁজা খাওয়া হয়নি। আজ ভাসানটেক সরকারি কলেজ একটা ফুলের বাগানের মত হয়েছে।

ভাসানটেক সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় এবং আমি কখনোই কাউকে গালিগালাজ করতাম না। বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু জয় করতাম। আমি বই পুস্তক পড়ে শিখেছি– কোন মানুষকে অস্ত্র দিয়ে জয় করা যায় না; বুদ্ধি দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে জয় করা যায়।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক ও নবম-দশম শ্রেণির রসায়ন গ্রন্থের লেখক

বাবাদের কথা

আশরাফ আহমেদ

সৈয়দ মুসলেহ উদ্দিন আহমেদ

সম্প্রতি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েই অন্য রাজ্যে বাস করা বড়ছেলের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বড়বৌমা জিজ্ঞেস করেছিলো, 'আব্বু, তোমার যদি অতীতে ফিরে যাবার কোনো উপায় থাকতো, তবে জীবনের কোন অংশটুকু তুমি ভিন্নভাবে সম্পন্ন করতে বলে মনে হয়?'

আমি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে উত্তর দিয়েছিলাম, আমার বড়ছেলে যে পরিমাণ মমতা, নিষ্ঠা ও গুরুত্বের সাথে ওর সন্তানদের সময় দেয়, নিজ ছেলেদের জন্য আমি ঠিক তাই করতাম।

দশ মাস আগে বিয়ে হওয়া ছোটবৌমা থেকে টেক্সট মেসেজ পেলাম গেল শুক্রবার। লিখেছে, 'এই সপ্তাহের মতো সপ্তাহান্তটিতেও আপনাদের ছোটছেলে সন্ধ্যা থেকে সারারাত পর্যন্ত অপিসের ডিউটিতে ব্যস্ত থাকবে। তাই আপনারা ব্যস্ত না থাকলে আজ সন্ধ্যায়ই আপনাকে ও আম্মুকে নিয়ে আমি একাই (আপনাদের পছন্দের) কোনো রেস্তোরাঁয় সান্ধ্যভোজে যেতে চাই।'

বুঝলাম, বৌমা কোনো একদিন বাবা হতে যাওয়া ওর স্বামীর কর্তব্যটিই পালন করতে চাইছে।

পিতৃ-চরিত

আমার পিতার নাম ছিল সৈয়দ মুসলেহ উদ্দিন আহমেদ। ডাক নাম আবুল খায়ের। আমাদের বাবা-মায়ের বিবাহিত জীবনের শেষের দিকের সন্তান আমরা। কাজেই তখনকার বয়স বিচারে আব্বাকে আমি অনেকটা বার্ধক্য অবস্থায়ই দেখেছি। কিন্তু তাঁর চালচলন ও চিন্তাচেতনায় কোথাও সেই ছাপ ছিল বলে মনে হয়নি। শাসন করার জন্য কদাচিৎ তিনি শারীরিক নির্যাতন করতেন। অথচ তাঁকে আমরা যথেষ্ট ভয় পেতাম, কিন্তু শ্রদ্ধার সাথে। কোনোদিন যদি আমাদের কাউকে শারীরিক শাস্তি দিতেন, তবে সেই সন্ধ্যায় আবার কাছে বসিয়ে নিজের পাত থেকে 'দুধটা-কলাটা' আমাদের পাতে দিয়ে দিতেন। সন্তানের প্রতি ননী-মাখনের মতো নরোম তাঁর স্নেহানুভূতি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করতো। মাঝারি উচ্চতায় হালকা-পাতলা গড়নে গায়ের বর্ণ ছিল তামাটে। তাঁর গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ, খাড়া নাক, চিবুক ও থুতনির মাঝে পাতলা ঠোঁট দুটোতে বিরাজ করতো গাম্ভীর্য। অন্যথায় কথা বলতেন ঠোঁটে মিষ্টি একটি হাসি নিয়ে।

বাংলা ১৩০৮ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ রবিবার, ইংরেজি ১৯০২ সালের ৭ই ডিসেম্বর, তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাজিপাড়ার সৈয়দ মঞ্জিলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এবং মাতার নাম ছিল সৈয়দা তৈয়বা খাতুন। আমার দাদার জন্ম ও পিতৃনিবাস ছিল নাসিরনগর থানার গোকর্ণ গ্রামের সৈয়দ বাড়ি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রসিদ্ধ সৈয়দ বাড়িতে ঘরজামাই হয়ে বসবাস করলেও দাদার নিজস্ব গুণাগুণের অভাব ছিল না। বৃটিশ ভারতে তিনি ছিলেন সাবরেজিস্ট্রার। সেই যুগে শহরের গুণী লোকদের সরকার থেকে বিচারকার্যে নিয়োগ করা হতো। সেই অনুযায়ী দাদার আরেকটি পরিচয় তিনি সরকার নিযুক্ত 'অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট'ও ছিলেন।

চার ভাই ও তিন বোনের মাঝে আব্বা ছিলেন দ্বিতীয় ও সবচেয়ে মেধাবী। তিনি ১৯২১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স (পরবর্তীতে যাকে ম্যাট্রিক বলা হতো) পাশ করেন। তখন পরীক্ষাটি হতো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। অধিকাংশ হিন্দু ছাত্রের মাঝে এক মুসলমান ছাত্রের প্রথম বিভাগে পাশ করার অসামান্য সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে দাদার উর্ধতন ইংরেজ সাহেব বলেছিলেন, 'Your son is a smart boy, ask him to get prepared for medical school.' দাদা ছেলেকে ডাক্তারি পড়ার খরচ জোগানোর সাধ্য নাই জানালে সেই বিলাতি বস

বলেছিলেন, তিনি নিজে সেই খরচের ব্যবস্থা করবেন। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে আব্বা ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। গ্রীষ্মের ছুটিতে এক বন্ধুর গ্রামের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে গুরুতর অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। সন্তানের প্রতি স্নেহাধিক্যের ফলে মা (আমার দাদি) তাঁকে আর ঢাকা যেতে দিলেন না। ফলে সেখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার ইতি ঘটেছিল। শূলবেদনা নামের সেই অসুস্থতা তাঁর আজীবন সঙ্গী হয়ে ছিল। এক সময়ে তাঁর কপালে সেই আমলে দুষ্প্রাপ্য এক সরকারি কেরানির চাকুরি জুটলো। চাকুরিতে প্রমোশন হয়ে হয়ে কুমিল্লা জজ কোর্টের সেরেস্তাদার হিসেবে ১৯৫৮ সালে কর্মজীবন থেকে অবসরে যান। সেই জমানায় সেরেস্তাদার মোটামুটি সম্মানজনক পদ হলেও তিনি এটিকে কেরানির চাকুরি বলেই গণ্য করতেন। আমরা ছিলাম মাবাবার শেষ বয়সের ৮টি সন্তান। কোনো সন্তানকেই তাঁর অপছন্দনীয় কেরানির চাকুরির পথে যেতে দিতে উৎসাহী ছিলেন না। ফলে তাদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে ভগ্নস্বাস্থ্যে আব্বা প্রায় আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন।

ছেলে উপযুক্ত হলে বিয়ের জন্য দাদা কনের খোঁজ করেন। জানা গেল শাহবাজপুর গ্রামনিবাসী দারোগা মোহাম্মদ লতিফুদ্দিন আহমেদের এক সুন্দরী ও বিদুষী কন্যা বিবাহযোগ্যা। দাদা গেলেন সেখানে। কন্যার পিতা বললেন, কিন্তু ওর বিবাহের দিনতো স্থির হয়ে গেছে উচ্চশিক্ষিত এক পাত্রের সাথে, আগামী সপ্তাহেই বিয়ে, কেনাকাটিও সব হয়ে গেছে! দাদা বললেন তাতে কী, বিয়েটাতো এখনো হয়নি! আমার নানা পাত্রের সাথে নয়, তাঁর আদুরে কন্যাকে বিয়ে দিলেন 'হাড্ডির' (বংশের) সঙ্গে। কাজেই আমার মা আমার বাবার স্ত্রী হয়ে সৈয়দ মঞ্জিলে এসে উঠলেন। তা না হলে সৈয়দ মুসলেহউদ্দিন আহমেদ আমার বাবা হতেন না!

আম্মার কাছে শুনেছি যৌবনে আব্বা খুব সৌখিন ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় সোনার চেইন ও বোতাম লাগানো 'গিল্টি করা' পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ক্লাবে বন্ধুদের সাথে তাস খেলতেন। সোনালি রঙের সেই চেইন আমরা আম্মার আলমারিতে দেখেছি। তাঁদের বাহির বাড়িতে গান বাজনার জন্য একটি ঘর নির্ধারিত ছিল। বাঁশি, তবলা ও হারমোনিয়াম যোগে তিন ভাই মিলে গানের চর্চা করতেন। বাড়ির পুরনো জিনিসপত্রের মাঝে ছোটকালে আমরা তাঁর অকেজো হারমোনিয়াম এবং ঘুণে ধরা তবলা ও ডুগি দেখেছি। আব্বার প্রতি শ্রদ্ধাবোধে সেগুলো যেন আর নষ্ট না হয়ে যায় তাই যত্ন করে রাখতাম। কোথাও কোথাও কিছুটা বাঁকা হয়ে গেলেও ফুঁ দিলে আব্বার পিতলের লম্বা বাঁশিটি থেকে তখনো শব্দ বেরোতো।

আব্বার গানের গলা খুব ভালো ছিল বলে আম্মা ও চাচিদের মুখে শুনেছি। চাচিদের মুখে একটি অদ্ভুত কথাও শুনেছি। গলার স্বরটি মসৃণ করার জন্য আব্বা-চাচারা ঘি-তে চোবানো ইঞ্চি-প্রশস্ত খসখসে কাপড়ের একটি ফিতার একপ্রান্ত আঙ্গুলে ধরে বাকিটি গিলে ফেলতেন। তারপর ধীরে ধীরে সেটি টেনে বের করতেন! তাতে নাকি গলাটি পরিষ্কার হতো! কুমিল্লার কোনো মিষ্টির দোকানে আব্বা প্রায়ই যেতেন। সেখানে বসে এস ডি বর্মণ গান গাইতেন বলে আব্বার মুখেই শুনেছি। তাঁর বলার ভঙ্গি থেকে আঁচ করে নিয়েছিলাম যে তিনিও সেই আসরে গাইতেন। আর কুমিল্লায় আমার ফুপুর বাসায় এস ডি বর্মণকে নিয়ে যে রাতভর গানের জলসা বসতো তা ফুপুর বয়ান থেকেই জানা যায়। এক সময় আব্বা গান বাজনার চর্চা একেবারেই বন্ধ করে দেন আমার জন্মের বেশ আগে, কারণটি পরে বলছি। তাঁর গানের গলাটি যে অত্যন্ত সুন্দর ছিল তার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন পরবর্তীতে রেকর্ডকৃত কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে।

ছোটকালে চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় আমি আব্বার অগোচরে তাঁর আলমারিটি ঘাঁটাঘাঁটি করতাম। সেখানে লুকানো সুন্দর হস্তাক্ষরে তাঁর লেখা অনেক কয়টি গানের পাতা আমি মাঝে মাঝেই পড়তাম। প্রতিটি পাতার প্রথমেই ছন্দ বা তালটি সম্পর্কে লেখা থাকতো দাদরা, কাহারবা, ভৈরবী, মালকোষ, খেমটা ইত্যাদি। খুব আগ্রহ হতো সেই গানগুলো শোনার ও জানার। কিন্তু প্রথমত আমার অনধিকার চর্চা এবং দ্বিতীয়ত আব্বা তখন নিজে গানবাজনা করেন না বলে তাঁকে জিজ্ঞেস করার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। এক সময় হয়তো তিনি টের পেয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর গোপনীয় অতীত কেউ নাড়াচাড়া করে দেখছে। পরে তাঁর আলমারিটি তন্নতন্ন করে খুঁজেও সেগুলোর হদিস আর পাইনি। যৌবনকালের গানবাজনায় আসক্তির চিহ্নকে পরিণত বয়সে হয়তো তিনি অতীতের লজ্জা বা পাপ বলে মনে করতেন।

আব্বার কাপড়চোপড় এবং বিছানা থাকতো খুব পরিষ্কার ও ফিটফাট। কেউ শিখিয়েছিলেন বলে মনে নেই, কিন্তু তাঁর বিছানায় ও চেয়ারে বসাটা আমাদের জন্য বেয়াদবি বলে জানতাম। আব্বার আরো দুটি শখ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। একটি হচ্ছে গোলাপ ফুলের বাগান করা। কলম করে সুগন্ধি গোলাপ গাছের চারা বানাতেন নিজ হাতে। সেটি মাটিতে রোপণ করে সার হিসেবে গোড়ায় পুঁটি মাছ পুঁতে দিতেন। তাতে নাকি ফুলের গন্ধটি ভালো হয়। নিজের লাগানো সুগন্ধি বেলিফুলের এবং জুঁইফুলের ঝাড়ও ছিল তাঁর পরিচর্যাধীন। অনেক পুরনো সেই গাছগুলো আমরাও দেখেছি।

তাঁর অপর শখটি ছিল সুগন্ধি আতর সংগ্রহ করা। সূক্ষ্ম ধাতুর কারুকাজ করা তাঁর চারকোণা কাঠের একটি আতরদানি ছিল। নরম মখমলের মেরুন রঙের কাপড়ে সাঁটা ভেতরটি ছয়টি খোপে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি খোপে ছিল কাচের গোল ঢাকনাসহ প্রায় এক ইঞ্চি মোটা মোটা বাহারি কাচের বোতল। প্রতিটি বোতলে ছিল একেক ধরনের আতর।

ঈদের সময় নিজ হাতে সেই আতরে তুলো চুবিয়ে আমাদের কাপড়ে মেখে বাকিটা কানে গুঁজে দিতেন। আব্বা বলেছিলেন সেই আতর কেনা হতো 'পশ্চিম' থেকে ফেরি করতে আসা আতর-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। কোনটি আসল আতর তা পরীক্ষার জন্য চুবানোর পর একটি তুলাপিণ্ড চিপে চিপে আতরটি পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতেন। সেটি তখন কেরোসিনে চুবানো হতো। আবার চিপে চিপে কেরোসিনটি ফেলে দেয়ার পরও যদি তুলোতে শুধুই আতরের গন্ধ পাওয়া যেতো সেটিই কিনতেন।

ছোটকালে বাসায় অনেক পুরনো হয়ে যাওয়া সাদা রঙের কয়েকটি ধাতব ট্রে এবং কালো ছাপসহ আয়তাকৃতির কাচ দেখেছি। আম্মা বলেছিলেন বিয়ের পর আব্বা ক্যামেরা দিয়ে তাঁর এবং বাড়ির অন্যান্য মহিলাদের ছবি তুলতেন। ছবির নেগেটিভ হতো কাচের প্লেটে। আর সেগুলো সাদা ট্রেতে বিভিন্ন দ্রবণে চুবিয়ে আব্বা ডেভেলাপ করতেন। তা থেকে কীভাবে কাগজে প্রিন্টও করতেন। ধারণা করা যায় যে সে যুগে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের বাজারের স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তোলার প্রচলন ছিল না।

বড়শিতে মাছ ধরা, পাখি শিকার এবং বন্যপশু শিকার ছিল তাঁর আরেকটি শখ। মাছ ধরা এবং পাখি শিকারের অভ্যাসটি আমরা বড় হওয়া পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। শীতে বিল এলাকায় পাখির দল এলেই গ্রাম থেকে একটি লোক খবর দিত। তখন একেকবার একেক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং আমাদের তাঁর দোনলা বন্দুকটি চালানোও শেখাতেন। মা-চাচিদের কাছে শুনেছি একত্রে ফিরে আসা তিন ভাইয়ের পেছনে শিকার করা বিভিন্ন জাতের পাখি-বোঝাই গরুর গাড়ি বাড়ির উঠানে এসে ভিড়তো। ছোট পাখিগুলোর নাম যা মনে আছে সেগুলো হচ্ছে ছ্যারছেইরা, বেরবেইরা, হরিয়াল, বালিহাঁস ও বক। বড়পাখির নাম ছিল শামুককাচা, ল্যাঞ্জা, সারস ইত্যাদি।

তাঁর বন্যপশু শিকার করা আমরা ভাইবোনেরা কেউ দেখিনি। কিন্তু আমাদের বসার ঘরের তিনটি দেয়ালেই কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় হরিণ, মহিষ, এবং বনগরুর শিং শোভা পেতে দেখেছি। এখনো সে সবের কিছু অবশিষ্ট আছে। সেগুলো তাঁর শিকার করা ছিল কিনা তা জিজ্ঞেস করা হয়নি। ঘর সাজানোর উপকরণ হিসেবে কেনা হয়েছিল কিনা এতো বছর পর তা জানার কোনো উপায়ও নেই। তবে তাঁর বন্দুকের গুলি-কার্তুজের বাক্সটি খোলা হলে কোনটি বাঘের গুলি, কোনটি হরিণের গুলি এবং কোনটি কোন ধরনের পাখি শিকারের গুলি তা আমাদের বুঝিয়ে বলতেন।

মাত্র একটি দৃশ্য দিয়ে যদি আব্বার চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে হয় তবে আমার ভাইবোনের প্রত্যেকেই বলবেন তিনি চেয়ারে বসে বা ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়েছেন। তাঁর ছিল বই ও পত্রপত্রিকা পড়ার নেশা। প্রতি বিকেলে তাঁর বন্ধু রশীদ ডাক্তারের চেম্বারে বসে বাংলা 'ইত্তেফাক' ও ইংরেজি 'পাকিস্তান অবসারভার' পত্রিকা পড়তেন। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সাময়িকীর নিয়মিত খদ্দের ছিলেন তিনি। সেগুলো আমিও পড়ে নিতাম। আমেরিকার ইউসিস, সোভিয়েত দূতাবাস এবং জাতিসংঘের সচিত্র সাময়িকীগুলো পেতেন প্রতি মাসে। জাতিসঙ্ঘের রঙিন পত্রিকাটির নাম ছিল 'প্যানোরোমার ছবির পাতা'। বাংলা মাসিক 'মাহে নও' এবং এখন নাম ভুলে যাওয়া আরেকটি সাহিত্য পত্রিকার বেশ কিছু গল্প আমার এখনো মনে আছে। ছোটকালে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর আলমারিতে 'কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরের ইতিহাস' অথবা তেমন নামের গোটা গোটা অক্ষরে হস্তলিখিত একটি লম্বা ও মোটা পাণ্ডুলিপি দেখেছিলাম। পরবর্তীতে সেটি আর দেখতে পাইনি। কোথাও লিখিত কিছু দেখলে তা তাঁকে অবশ্যই পড়তে হতো। এমন কি বাজার করে আনা কাগজের ঠোঙার এপিঠ-ওপিঠ পড়াও বাদ যেতো না। আমার ধারণা তখন তিনি লাইব্রেরির সবগুলো বইই পড়ে ফেলেছিলেন।

আব্বার চরিত্রে পাখি ও বন্যপ্রাণি শিকারের সাথে ফুলের বাগান করা ও সঙ্গীত সাধনার সহাবস্থান আমার কাছে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বলে মনে হয়। অবাকও হই। বাগান করা, ফুলকে ভালোবাসা, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত চর্চা মানুষের মনের কোমলতা ও সৃজনশীলতার প্রমাণ দেয়। কিন্তু বন্যপশু হলেও প্রাণি হত্যা, বিশেষ করে আকাশে ওড়া সুন্দর, কাব্যিক ও নিরীহ পাখির প্রাণ বধ করা নিঃসন্দেহে হিংস্রতারই নামান্তর। আব্বার মৃদুভাষী, নিরহংকারী, মিষ্টি হাসি, বইপ্রেমী চরিত্রের সাথেও পাখি শিকার করাটা কোনোমতেই মিল খায় না। আপাতদৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক এই দ্বিমুখী চরিত্র আব্বার অন্যান্য আত্মীয়ের মাঝেও লক্ষ করেছি। একজন শুধু সঙ্গীত চর্চাই নয়, রং তুলি দিয়ে ছবিও আঁকতেন। সেই যুগের ও আব্বাদের সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের জীবনযাপনের কথা জানা গেলে এর উত্তর হয়তো পাওয়া যাবে।

কয়েক মাস জাপানে কাটিয়ে ১৯৭৯ সালে আমি দেশে ফিরে এসেছি। আব্বার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটছে। আম্মা জানালেন, তিনি মাঝে মাঝে চোখ খোলা রেখে তাঁর মৃত বাল্যবন্ধুদের নাম উচ্চারণ করে করে প্রলাপ বকছেন। ডাক্তার বললেন তিনি ইস্কেমিক হার্টের সাথে ফুসফুসে পানি জমা বা প্লুরিসি রোগে ভুগছেন। কয়েক মাস আগে তাঁর ছোটভাই হাসপাতালে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি তাই হাসপাতালে যেতে রাজি নন। ডাক্তারকে বাসাতেই নাকে অক্সিজেন লাগানোর ব্যবস্থা করতে বললেন।

অক্সিজেনের খোঁজে আমি সারাদিন হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরে বিফল হলাম। সন্ধ্যায় তাঁর আপন এবং বহু যুগের অদেখা খালাত বোন (মুনীর চৌধুরীর মা) এলেন সন্তানদেরসহ। সম্পূর্ণ সুস্থের মতো আব্বা সবার সাথে গল্প

করলেন অনেক্ষণ। ক'দিন আগে একটি মামলার বিচারিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকার জেলা জজ তাঁর ভাগ্নের সাথে গুরুগম্ভীর আলোচনা করলেন। তাঁরা চলে গেলেন রাত এগারোটায়। রোগীর সেবা করতে বড়ভাই ঘুমালেন আব্বার পাশে। রাত বারোটায় দরজায় মৃদু করাঘাত শুনে বেরোতে বড়ভাই বললেন তাড়াতাড়ি এসো, আব্বা কেমন যেন করছেন।

ছুটে এসে দেখি আব্বার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। মাথাটি কোলে তুলে নিলাম। কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম– আব্বা, খুব খারাপ লাগছে কি? মৃদুস্বরে বললেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা। মনে হচ্ছে মরে যাচ্ছি'। কয়েক মিনিট পর সামান্য শব্দে তাঁর বন্ধ ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে 'ফুস' শব্দে একটি বায়ুখণ্ড বেরিয়ে গেল। দিনটি ছিল ১৯৭৯ সালের ২০শে অক্টোবর।

সন্তানের মঙ্গলের জন্য মায়েদের জীবন বিসর্জনের উদাহরণ ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। কিন্তু পিতাদের ক্ষেত্রে সেরকম খুব বেশি দেখা যায় না। প্রায় বৃদ্ধ বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সন্তানদের ভবিষ্যৎকে কণ্টকমুক্ত করতে তাঁর অমানুষিক পরিশ্রম ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ! আমার দুঃখ, পিতা হিসাবে সন্তানদের প্রতি তিনি যে কঠোর দায়িত্ব পালন করেছিলেন, পুত্র হয়ে আমি এর সামান্য প্রতিদানেরও কোনো সুযোগ পেলাম না!

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী বায়োমেডিকেল বিজ্ঞানি।

সাম্প্রতিক ভাবনা

আতাউর রহমান পাশা

১

কখনো ভাবিনি
কোন এক বাঁশ ঝাড়ের ভিতর থেকে উঁকি দেয়া
উর্বশী চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় স্নাত
টিনের চালাঘরে জন্ম নেয়া এক শিশু
পেরিয়ে অনেক পথ এখানে বন্দি হবে,
অভব্য উৎকট শহরের অরম্য
দালানের দেয়ালে অন্তরিন হবে
অনিশ্চিত গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে
মহামারি শঙ্কায় বিপন্ন অবয়বে।

২

যাপিত জীবন এক অভ্যাস নিত্যকার ছক বাঁধা কাজ
রাঁধো বাড়ো খাও ঘুমাও কখনো ফোনালাপ অজস্র কথার অর্থহীন কারুকাজ
নিহত সংখ্যা সারি প্রতিদিন বিরতি নেই পঁচিশ আটাশ বিয়াল্লিশ
বারতা নেই প্রাণান্ত শ্রম খোঁজে কোথা সে অমৃত নির্বিষ
জীবনের লেনদেন জনপদে বিকিকিনি পসরার তুমুল আয়োজন
বোধের গোচরে নব ব্যঞ্জনা এই বুঝি 'নিউ নরমাল' নবতর নিষ্ঠুর জীবন
মানুষের ভিড়ে বাস, শূন্যতায় তবুও প্রান্তরে নিঃসঙ্গ
নির্ঘুম দুর্বিষহ অতন্দ্র প্রহর
চাতক পাখি ডানা ঝাপটায় মেঘ তবে কোথা
কোন ক্ষণে দেখা দেবে উজ্জ্বল ভোর
দীর্ঘ সুড়ঙ্গ শেষে আলো নেই, গন্তব্যে
মৃত্যুর চেয়ে সত্য আর কি অধিক
করোটির গহীনে শব্দ গুচ্ছ ছন্দ তোলে অবিরাম
নিমেষেই শবের মিছিলে হতে পারি আমিও শরিক।

তাঁকে যেমন দেখেছি

আরশাদ সিদ্দিকী

তাঁকে দেখেছি প্রায় চল্লিশ বছর আগে। একই অবস্থানে। স্থাণু। যেনো শাখা-পাতাহীন বৃক্ষ। মরুময় প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছেন। যদি কখনো জলের ধারায় সিক্ত হতে পারেন।

এটাই তার গোপন বাসনা কিনা জানি না। মরু প্রান্তরে জলের ধারায় সিক্ত হলেই তার ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার সাধনার অবসান হবে?

আমার ওসব কিছু জানা নেই। শুধু সেই শৈশব কাল থেকে দেখেছি তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। গলায় ঝুলানো একটা ছোট্ট ঝুড়ি, তাতে বুট-বাদাম।

তিনি বুট-বাদাম বিক্রি করেন। সেই কবে, কত যুগ আগে তার কাছ থেকে কেনা হতো চার আনার বুট নয়তো বাদাম। তাই ভাগাভাগি করে খাওয়া।

আজ প্রায় চল্লিশ বছর পর। একই জায়গায় তার সাথে দেখা। হাতঘড়িতে বাধাহীন সময় এখন আমার। ভাবলাম আজ খানিকক্ষণ তার সাথে কথা বলা যায়।

তার গলায় সেই বুট বাদামের ঝুড়িটা ঝোলানো। আমার দিকে তাকালেন। বয়সের ভারে আমার চেহারা বদলেছে। তিনি সেই একই রকম।

মরু প্রান্তরের বিশুষ্ক বৃক্ষের মত। তবুও আমাকে চেনার চেষ্টা করলেন। একসময় চিনতে পারলেন। খুব কষ্ট করে মলিনভাবে হাসলেন।

তিনি হয়তো ভাবছিলেন বুট নয়তো বাদাম কিনবো। আমি কেনাকাটার বদলে জীবনে প্রথমবার জানতে চাইলাম, 'কেমন আছেন?'

একটু যেন ধাক্কা খেলেন। কেউ হয়তো তার কাছে এই প্রশ্নটা কখনো করেনি। উত্তরের বদলে আবারো সেই মলিন হাসি।

এই হাসির মানেটা কি? নাকি তিনি জানেন না কেমন আছেন! নাকি কেমন আছেন এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁর কিছু বলার নেই?

আমার হাতে অঢেল সময়। আবারো জানতে চাইলাম, কেমন আছেন? মলিন হাসিটা যেন করুণ হয়ে উঠলো। বললেন, আছি।

এই 'আছি'র মানে কি? আমি জানি না। তিনিও কি জানেন? বেমাক্কা বেবুঝ খেলায় আমি ক্ষান্ত হতে নারাজ। 'বাড়িতে সবাই ভালো আছে?'

প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারি, আমি বেকায়দায় পড়ে গেছি। তার বাড়িতে কে কে আছে, আমিতো জানি না। কোনদিন জানতে চাইনি।

এমন কি তার নাম, তাও জানা নেই। শৈশবের কতো কতো বিকেল কেটেছে, তার কাছ থেকে কেনা বুট-বাদাম চিবোনোর ফাঁকে ফাঁকে নানান গালগল্পে।

অথচ তার নামটাও কোনদিন জানতে চাইনি। কোথায় থাকেন তিনি, তার পরিবারে কোনো সদস্য আছে কিনা! তাঁর কি কোনো আদি নিবাস ছিলো?

আমার খুব অসহ লাগে। নিজের অজ্ঞানতাকে জামা-কাপড়ের মতো ভাঁজ করতে থাকি। এই জীবনের সকল অভিজ্ঞান মনে হয় বড্ড বেশি মেকি। নির্মানবিক।

লেখক: সাংবাদিক, কবি ও প্রাবন্ধিক

ব্যতিক্রমী উৎকর্ষতার প্রয়াস ‘বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি’ সাময়িকী

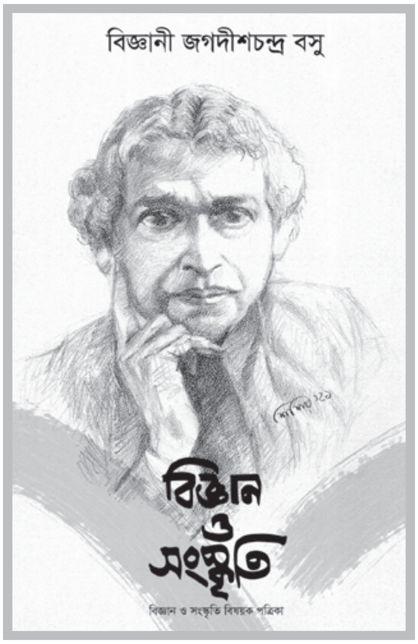

দেশ এগুচ্ছে, পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়। বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞানের বদৌলতে পৌঁছে গেছে সভ্যতার উচ্চ শিখরে। চলছে নতুন নতুন আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন। বর্তমান সময়ে ডিজিটালাইজেশনের ফলে মানুষের ধ্যান-ধারণায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এ পরিবর্তনকে সামনে রেখেই গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ভাষার মাসে প্রকাশ হয় ‘বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি’র প্রথম সংখ্যা। দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ২০২১এ। সম্পাদকীয়তে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, ‘প্রকৃত সুস্থ বিজ্ঞানচর্চার সমাজিক প্রসার ঘটানোই এর মূল লক্ষ্য।’

প্রকাশিত কাগজে লিখেছেন দেশের অনেক খ্যাতিমান বিজ্ঞানি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গবেষক, কবি ও গল্পকার। স্থান পেয়েছে তাঁদের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প, প্রকাশিত বইয়ের সমালোচনা ও মননশীল কবিতা। লেখা নির্বাচনে বিজ্ঞান, রাষ্ট্র, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের সুন্দর সম্মিলন ঘটেছে। শিল্পী শিশির মল্লিকের প্রচ্ছদে দুটো সংখ্যাই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

চলতি সংখ্যার পত্রিকায় প্রথম লেখাটির সূচনা হয় সাময়িকীটির প্রধান সম্পাদক যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানি আশরাফ আহমেদের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ দিয়ে। এতে তিনি বিজ্ঞানি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা গ্রন্থ ‘অব্যক্ত’ নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা থেকে আমরা পদার্থ ও উদ্ভিদবিজ্ঞানি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অজানা অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। জানতে পারি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু শুধু একজন বিজ্ঞানিই ছিলেন না, ছিলেন একজন সুলেখকও। আশরাফ আহমেদ উল্লেখ করেছেন এই মহাপুরুষ পদার্থবিজ্ঞানের মতো কঠিন বিষয়কে বাংলাভাষী পাঠকের কাছে রসময় করে উপস্থাপন করেছেন। তিনি আরও বলেছেন এই মহান মানুষটির গভীর দেশপ্রেম, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতা ও বাংলা ভাষার প্রতি অবিচল নিষ্ঠার কথা। একজন শুদ্ধ মানুষের প্রতিচ্ছবি ছিলেন তিনি। তাঁর রচনাশৈলীর অন্তর্নিহিত দর্শন উপলব্ধি আজকের শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষণীয়ও বটে।

অত্যাধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার যুগে বিশ্বব্যাপী করোনার ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়ছে, থমকে গেছে অর্থনীতির চাকা ও জীবন-জীবিকা। মৃত্যুর মিছিল হচ্ছে দীর্ঘ। এ বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে এ সংখ্যায়।

নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও গবেষক রাহমান চৌধুরী ‘গত শতকে স্পেনিশ ফ্লু আর বর্তমান করোনাভাইরাস’ শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ‘গত শতকে বিশ্বে এক স্পেনিশ ফ্লুতেই পঞ্চাশ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয় এবং দুই থেকে পাঁচ কোটি মারা যায়। এর পর সার্স এবং মার্সের অভিজ্ঞতাও বিশ্ববাসীর আছে। অতএব ভাইরাস আছে ও থাকবে। এর প্রতিষেধকও মানুষ আবিষ্কার করছে, করবে। সুতরাং এই ভয়াবতার মধ্যে যেসব দেশ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করেছে তাদের সংক্রমণ এবং মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণে আছে।

‘হলুদের গুঁড়ো যদি ভাইরাস হতো’ প্রবন্ধে মোস্তফা তানিম একটি হলুদের কণার সাথে করোনাভাইরাসের তুলনা করতে গিয়ে বলেন যে, একটি হলুদের কণিকা ৫০ মাইক্রন (মাইক্রোমিটার) যা খালি চোখে দেখা যায় না। তার আয়তনের চেয়েও ৫০০ গুণ নিচে রয়েছে এই করোনাভাইরাস। এটি এতই ছোট যে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ ছাড়া কাচের লেন্সের (অপটিক্যাল) মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় না। এই ভাইরাস সংক্রমিত হয় শ্বাসের মাধ্যমে অথবা স্পর্শের মাধ্যমে। সুতরাং এই এত ক্ষুদ্র অণুজীব থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখার উপায় হলো সচেতনভাবে সতর্কতা অবলম্বন।

সাময়িকীটির নির্বাহী সম্পাদক নাজনীন সাথী তাঁর ‘করোনাময়তা: এসো নত হই তাদের কাছে’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, মানবসভ্যতার নামে মনুষ্যপ্রজাতি কী না করেছে এই গ্রহটিতে। তিনি উল্লেখ করেন এতসব মহামারির পরও থেমে নেই আমাদের কৃষি ও কৃষক। কোভিডের প্রতিষেধক টিকা ইতোমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি আশবাদী, কোভিড আমাদের পিছু নিলেও, আমাদের অগ্রযাত্রা থেমে থাকবে না।

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান তার 'নীল আর্মস্ট্রং ও চাঁদে তাঁর পায়ের ছাপ' শীর্ষক প্রবন্ধে চাঁদে নীল আর্মস্ট্রংয়ের সাহসী পদক্ষেপ এবং অ্যাপোলো ১১এর নভোচারীদের স্মরণ করেন। নীল আর্মস্ট্রং আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু চাঁদে প্রথম পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি মহাশূন্যে মানুষের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে গেছেন।

'ঈশ্বরের কাছে ধর্মীয় প্রতিনিধিদল' বিজ্ঞানধর্মী গল্প এবং 'ডোম' প্রেমের গল্প–এ দুটো গল্প এ পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। শিক্ষাবিদ বিজ্ঞান-দর্শনের গবেষক শহিদুল ইসলাম বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকারক দিকসমূহ নিয়ে ঈশ্বর এবং ধর্মসম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের কথোপকথনের মাধ্যমে গল্পের শুরু করেন। ঈশ্বরের কাছে পোপ অভিযোগ করেন যে, মানুষ এখন ধর্মকর্ম ছেড়ে দিয়ে স্মার্টফোনে আসক্ত হয়ে আছে। অন্যদিকে প্রাণিরা অভিযোগ করে মানুষ তাদের আবাসভূমি উজাড় করে তাদের বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পোপ এবং প্রাণিদের অভিযোগ শুনে আইনস্টাইনের ভাষায় ঈশ্বর উত্তর দিলেন, 'প্রযুক্তি যেদিন মানুষের মস্তিষ্ক পুরোপুরি দখল করবে সেদিন মানুষ ইডিয়টে পরিণত হবে।' এ গল্পের মধ্য দিয়ে গল্পকার চমৎকারভাবে আগামী দিনের মানুষ কোথায় যাচ্ছে এবং কোথায় যাবে তার একটি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

'ডোম' একটি অসমাপ্ত প্রেমের গল্প। গল্পকার আখতার জামান অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাহিনিবিন্যাস, শব্দচয়ন, উপমার ব্যবহার এবং নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে অবিনাশ দাস নামের একজন ডোমের জীবন্ত ছবি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সরকারি চাকুরিবিধিতে ডোমের কোন নিয়োগ নেই। অবিনাশের বেতন কুড়ি টাকা মাত্র। বাপের মৃত্যুর পর বেতনের পাওনা টাকা তুলতে গেলে অফিসের লোকদের হয়রানি, সামান্য বকশিশ সমাজের এসব বাস্তবচিত্র ও অসঙ্গতিগুলো লেখক সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অবিনাশ লাশ কেটে আত্মীয়দের কাছে তুলে দিয়ে বকশিশ চায়। বকশিশের টাকায় সে মদ খায় এবং সংসার চালায়। অনেকে বকশিশ দেয়, আবার কেউ কেউ দেয় না, নেতানেত্রী হলে চাকরি খাবার ভয় দেখায় ইত্যাদি। অবিনাশের স্ত্রী মহুয়া দাস মিউনিসিপ্যালিটির মেথরনি। সে ভাল বেতন পায়। এরপরও ঘরে অবিনাশের মন বসে না। কারণ বস্তির মেয়ে চন্দনাকে সে ভালবাসে। কিন্তু চন্দনা তাকে পাত্তা দেয় না। অবিনাশ চন্দনাকে পায়নি। তাই সে মদ খেয়ে মর্গের পাশে পড়ে থাকে ও প্রায় প্রতিদিন দেরি করে বাড়ি ফেরে। চন্দনার সাথে শেষ দেখা হয় তার লাশকাটা ঘরে। অপমৃত্যু হয়েছিল চন্দনার। চন্দনার লাশ কাটতে গিয়ে অবিনাশের মনে তার বাবার কথা মনে পড়ে, 'সাবধানে রাখ বাপজান। লাশের চোখ আছে, সেই চোখে সব দেখে, কথা শোনে, সাবধান অবিনাশ।' চন্দনার নিথর মুখের দিকে চেয়ে অবিনাশের শেষ কথা: 'চন্দনা, সেই তো আইলি অবিনাশের কাছে, শেষ বেলায়।'

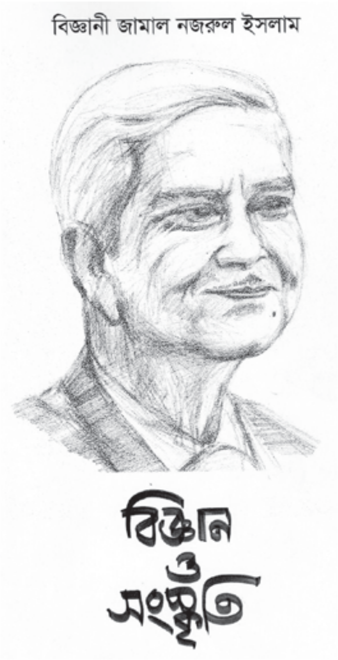

'কচুরিপানা নিয়ন্ত্রণ ও পানির উপরে মাচায় পেঁয়াজের চারা উত্তোলন' শীর্ষক লেখায় প্রফেসর ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা পাবনার বিল গাজনায় কচুরিপানা বদ্ধতার ফলে পেঁয়াজ চাষের অন্তরায় সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। শারীরিক, যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান করে পেঁয়াজের চারা উত্তোলন করা যেতে পারে। তাঁর বর্ণিত টেকনোলজি সময়োচিত একটি পদ্ধতি হিসেবে কৃষকগণ গ্রহণ করতে পারেন।

'ভাষার নীতি-দুর্নীতি-রাজনীতি ও বাঙালির উন্নয়ন' শীর্ষক প্রবন্ধে কুদরতে খোদা দীর্ঘ ৫০ বছরেও একুশের অঙ্গীকার হিসেবে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা না পাওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা ও হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন পারছি না তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। পরিশেষে তিনি কবির ভাষায় উচ্চারণ করেছেন: 'যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সে জন কিসের জন্ম নির্ণয় ন জানি।'

উল্কা ও উল্কাবৃষ্টি নিয়ে লিখেছেন সালেহা বেগম। উল্কাপিণ্ড কি, উল্কা কি দিয়ে গঠিত, মহাশূন্যে কখন উল্কাবৃষ্টি হয়, উল্কার গঠন, উল্কাপাতের ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে পরিবেশ ও প্রাণিদের উপর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন তিনি।

'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'র সম্পাদক আলমগীর খান 'ওষুধ কোম্পানি ও ডাক্তারের যোগসাজশ: যখন সর্ষের মাঝেই ভূত!' শীর্ষক প্রবন্ধে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় দুর্নীতি, অনিয়ম, ঔষধবিক্রেতা এবং চিকিৎসকদের স্বেচ্ছাচারিতার বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। যারা মানুষের দেখভাল করবে তারা যদি

অনিয়ম করে তবে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়! অর্থাৎ সর্প যদি মস্তকে দংশন করে তবে তাগা বাঁধবো কোথায়? মানুষের এ নৈতিক অবক্ষয় সমাজব্যবস্থায় পুঁজির লেজুড়বৃত্তির ফল। এ শৃঙ্খল থেকে আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানকে মুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

'পৃথিবীর কেন্দ্রে দৈত্যাকার কাঠামোটি মূলত ফাঁকা' শীর্ষক আলোচনায় মাহবুবুল ইসলাম বিজ্ঞানানুরাগী অসিত সাহার এ সংক্রান্ত মতকে যথার্থ বলেছেন। 'ভুলের ভয় কি?' লিখেছেন আনোয়ারুল আজিম খান অঞ্জন। তিনি বলেছেন, ভুল করা কোন অন্যায় নয়, মানুষ ভুল করেই শেখে এবং পৃথিবীর অনেক বিজ্ঞানি, শিল্পী ও রাষ্ট্রনায়ক বৃহৎ আবিষ্কার ও সৃষ্টি করেছেন ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই। প্রসঙ্গত তিনি কলম্বাস, লিভনিস, পিয়েরে কুরি, জন মিলটন, আলেকজান্ডার, এডওয়ার্ড ক্যাসনার, রন্টজেন, আলফ্রেড নোবেল প্রমুখের ভুলের কথা উল্লেখ করেছেন।

সাময়িকীটিতে আছে একটি বই-আলোচনা। 'আমাদের শিক্ষা: বিচিত্র ভাবনা' বইটি নিয়ে লিখেছেন আনোয়ার শাহীন। এ ছাড়াও আছে একটি নাট্য-আলোচনা। লেখক-সমালোচক সিরাজুদ দাহার খান 'ক্রাচের কর্নেল' নাটকটির বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করেছেন। এ পত্রিকায় দুটি কবিতা আছে: শিশির মল্লিকের 'স্বতন্ত্র বর্ণমালা' ও অনার্য নাঈমের 'প্রশ্নবোধক'।

পরিশেষে বলতে চাই, মানুষ এগিয়ে যাবে আরও অনেক দূর। বিজ্ঞানের ফলাফল বয়ে নিয়ে আসবে মানুষের কল্যাণ। আত্মকেন্দ্রিক উল্লম্ফনের এই সময়ে অনেক লিটল ম্যাগাজিন পড়েছে নানাবিধ টানাপড়েনে। এর মধ্যে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ে এই সাময়িকী প্রকাশনা নিঃসন্দেহে একটি সাহসী পদক্ষেপ। সবার সর্বাত্মক প্রয়াসে বেঁচে থাক এই সুন্দর উদ্যোগ।

- মাহ্‌ফুজ সালাম

স্বপ্ন ও সংগ্রাম

মিঠুন দেব

জুনি. অফিসার, এমআইএস বিভাগ, সিদীপ

জাগতিক ধরণীর বুকে জেগে থাকি আমি
আর জাগ্রত বহমান আমার অন্তর্যামী।
স্বপ্ন আমায় দেয় না দেখা–
সোনালী দিনের স্বপ্ন সেতো দেখি আমি।

ঐশ্বর্যপূর্ণ স্বপ্ন মশাই তারেই দেখা দেয় যার অবস্থান পাহাড়চিত্ত
আমায় কি করে দিবে সে দেখা যখন আমার পরিবার নিম্নমধ্যবিত্ত।

পড়শির ঐ সুগন্ধি আহারের সুবাস যখন সীমানা ডিঙিয়ে আসে ভেসে
মা তখন গল্প শোনানোর কৌশল করে সাদাভাত দেয় ঐ টলমল চোখে হেসে।
বুঝিনি তখন মায়ের হাসিতে কেন যে ছিল এতটা তীব্র দহন সংশয়
পরে বুঝেছি আমি তার ঐ হাসিতেই ছিল বিচক্ষণ অভিনয়।

যখন কোন পিতা উৎসবের পোশাক কিনে তার সন্তানদের তরে
নিম্নমধ্যবিত্তদের বাবারা তখন অন্তরালে আঁখি মোছে
দাঁড়িয়ে এক কোণে ছোট্ট কুঁড়েঘরে।

দেখেছি আমি কোমলমতি মায়ের অশ্রুসিক্ত নয়ন
কি করে নীরব নিভৃতে সে মায়ার সংসারে হতে থাকে দহন।
দেখেছি আমি পিতার অবুঝ হৃদয়ে আর্তনাদের হুংকার
কিভাবে গড়বে সে একটি অনটনহীন সোনালী সুখের সংসার।

বাবা আমার সহজ সরল যদিও রাগ ছিল তার বেশি
ভয়ে কখনো বলতে পারিনি বাবা–
চকলেট খেতে আমরা তোমার সন্তানরা খুব ভালোবাসি।

প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের সাথে করে বসবাস সংসার লালন করা
সে যে ভীষণ কষ্ট
বাবার দেয়া শিক্ষা আমার–যতই আসুক দুঃখ দুর্দশা তার মাঝেও যেন
অটল রয় ব্যক্তিত্বপূর্ণ আদর্শ–বাক্যটি ছিল স্পষ্ট।
সম্মানবোধকে অটুট রাখতে আলোকিত শৈশব কোথায় যে গেছে চলে–
সেইসব সাদাকালো শৈশবের কথাগুলো এখন কি আর হবে বলে।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরাই জানে ও পারে
শত সংগ্রামের মাঝেও তাদের মলিন হাসিকে কি করে রাখতে হয় ধরে।
যুগ হতে ঐ যুগান্তরে নিম্নমধ্যবিত্তদের মাঝেই ছিল
কতশত গুণীজনের বিচরণ অবাধ
নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় আত্মসংগ্রাম ও
জীবন বৈচিত্র্যের আসল প্রবাদ।

গোলক সমাজের ভিড়ে কি করে তাদের গড়তে হয় বলিষ্ঠ স্তম্ভ
নীরব নিভৃতে চলতে থাকে তাদের অনবদ্য সংগ্রাম
ভালোবাসার উদ্দীপ্ত আলোয় আলোকিত হয়ে থাক
নিম্নমধ্যবিত্তদের নাম।

‘আমাদের শিক্ষা নানা চোখে’ বই প্রসঙ্গে

নাহিদা হক

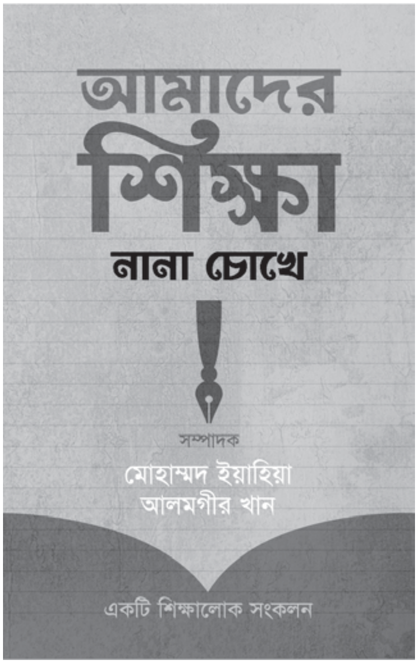

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও আলমগীর খান সম্পাদিত ‘আমাদের শিক্ষা: নানা চোখে’ বইটিতে সমাজের বিশিষ্টজনেরা তাদের লেখনির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। সিদীপ ও প্রকৃতি যৌথভাবে এটি প্রকাশ করেছে ২০২০ সালে। প্রচ্ছদ দেওয়ান আতিকুর রহমানের।

বইটি থেকে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের উপায় এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো উন্নত ও বিশ্বমানের করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমন্ধে জানতে পারি ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাছিতের লেখা থেকে। শিশির মল্লিকের লেখায় জানতে পারি একটি শিশু পূর্ণাঙ্গভাবে বেড়ে উঠতে হলে প্রয়োজন নিরাপদ সুন্দর পরিবেশের। রাদিয়া তানিম রিখেছেন, শিশুর যত্ন শুরু করতে হবে মাতৃগর্ভ থেকে। পরিবারই প্রতিটি শিশুর প্রথম শিক্ষাঙ্গন।

বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণে যে অনীহা দেখা যায় তা দূর করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে করতে হবে আনন্দদায়ক ও সৃজনশীল। ফাতিহুল কাদির সম্রাট লিখেছেন, তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে পড়ার টেবিলে। জাহিদুল ইসলাম মনে করেন, শিক্ষাপদ্ধতিকে করতে হবে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে, হতে হবে আরো যোগ্যতাসম্পন্ন। বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষাদানে শিক্ষকের করণীয় বিষয়ে লিখেছেন মো. তারেকুজ্জামান। আমাদের শিক্ষক সমাজ কেমন বা কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করেছেন মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম।

বইটিতে আছে হাজীগঞ্জ উপজেলার ‘বেগম রোকেয়া’ পদকপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সাবিহা সুলতানার কথা, লিখেছেন মো. শরিফুল হক। যিনি সমাজের শিক্ষাবিস্তারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আনোয়ারুল আজিম খান অঞ্জন লিখেছেন পাবনার রিকশাওয়ালা ময়ছেরের কথা। উনাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা উপকৃত হতে পারি। মোহাম্মদ আলীর লেখায় জানতে পারি দুইশত বছর আগে জন্ম নেয়া আধুনিক নার্সিং সেবার প্রবর্তক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা।

সাদিয়া ইসলামের কাছ থেকে মণিপাড়ার ঝুমা দাসের কথা জানতে পারি। যিনি নিজেকে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি হাতে তুলে নিয়েছেন সমাজের আরো শিশুদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব। মো. আমিনুল ইসলামের লেখা থেকে জেনেছি মার্জিয়ার ও কোহিনুর আখতারের লেখা থেকে লিমার কথা যারা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে, প্রতিবন্ধী বলে বাদ পড়েনি। শিখেছি সমাজের প্রতিবন্ধীদের কীভাবে অন্য সবার মতো করে গড়ে তোলা সম্ভব।

আরো জেনেছি, বিদ্যালয়ে সহপাঠী দ্বারা কোনো শিক্ষার্থী বুলিংয়ের শিকার হবার ফলে কীরূপ প্রভাব পড়তে পারে সেই শিক্ষার্থীর মনে। আমাদের উচিত এসব বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং সজাগ দৃষ্টি রাখা। বইটিতে এ বিষয়ে লিখেছেন রুমানা সুলতানা।

শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হবে কাজে, কথায় নয়। নিশ্চিত করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষাকে। রোধ করতে হবে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া। সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সরকারকে। তবে কেবল সরকারের ওপর সকল দায় চাপিয়ে দিলেই চলবে না। সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে। যেমনটা করছে সিদীপ, ব্র্যাক, আশা'সহ আরো বেশকিছু প্রতিষ্ঠান।

পৃথিবীতে যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে তা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে কুক্ষিগত হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণের ফলে এমন বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজে নারীশিক্ষার ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে করতে হবে আধুনিক। শিক্ষকদের দিতে হবে পাঠদান পদ্ধতির সঠিক প্রশিক্ষণ। শিক্ষাকে করতে হবে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা-নির্ভর। যার ফলে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে সমর্থ হচ্ছে না। এজন্য প্রয়োজন পরীক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন– যে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ড. মঞ্জুরে খোদা। প্রয়োজন হলে বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্বের উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুসরণ করা যায়।

লেখক: শিক্ষা সুপারভাইজার, ভোলাচং ব্রাঞ্চ, সিদীপ

শংকর দাশের কাব্য “গৃহে গৃহে জাগ্রত পা’

মাহ্ফুজ সালাম

‘গৃহে গৃহে জাগ্রত পা’–শংকর দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। একশো ছিয়ানব্বইটি কবিতা এ কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। শিরীন পাবলিকেশন থেকে এটি প্রকাশিত হয় ২০১৩র একুশে বইমেলায়। এর প্রচ্ছদ এঁকেছেন শাজু রহমান।

পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসন ও তা থেকে বাঙালির মুক্তি, সোনার বাংলার স্বপ্ন, দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সমাজব্যবস্থার ভাঙ্গাগড়া, শিক্ষাব্যবস্থার পটপরিবর্তনসহ নানা চড়াইউতরাই সবকিছু কবির চোখের সামনেই ঘটেছে। ১৯৭০-৭১ সালে তিনি ডাকসুর সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি একজন শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবক।

শংকর দাশ গভীরভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিরাজমান অসঙ্গতি, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসাগুলো কাছ থেকে দেখেছেন; ফলে তার কবিতায় ঝংকৃত হয়েছে সে সব বিষয়ের বহুমাত্রিকতা। তার হৃদয়ের ক্ষরণ কখনো দ্রোহ, কখনো প্রেম, কখনো এ দুয়ের মিশেলে প্রচলিত নিয়মের বেড়া ভেঙ্গে এক নতুন জীবনের প্রত্যাশায় উদ্বেল হয়েছে। তাইতো কবি মানুষের পায়ে পায়ে, হাতের মুঠোয়, কপালে, কব্জিতে, শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ও ঘর্মাক্ত শরীরে ঘামের মদিরতায় দেখেন মুক্তির সম্ভাবনা। সংগ্রামমুখর কয়েক দশকে রচিত কবির কবিতায় সঙ্গতকারণেই কলাকৈবল্যবাদিতার চেয়ে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা চিত্তমূলে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

কাব্যগ্রন্থের শুরুতেই কবির শাশ্বত উচ্চারণ: ‘গৃহে গৃহে জাগ্রত পা/বিপ্লব উদ্যত মিছিলে/হৃদয়ে হৃদয়ে ঘুমানো আগুন/এখন শুধু যে জ্বাললেই হয়/ভীরুরা থাকুক রুদ্ধ ঘরে/বিপ্লবী চিত্ত জানে না ভয়।’

‘ঝড় উঠুক’ কবিতায় কবি চান উত্তর দ্রাঘিমাংশ থেকে এমন ঝড় উঠুক, যে ঝড় অসাম্যের জঞ্জালকে উপড়ে ফেলে সাম্যতার সমাজ গড়বে: ‘ঝড় যে উঠুক, প্রবল ভীষণ বিধ্বংসী ঝড়/ বৃক্ষ উপড়ে পড়ুক উড়ে যাক সব পুঞ্জ পুঞ্জ জঞ্জালের স্তূপ।”

সত্যের আড়ালে মিথ্যার বেসাতি, ন্যায়ের বিপক্ষে অন্যায়ের দুর্বোধ্য প্রাচীর, মুখোশের আড়ালে মুখ। আমরা যেন প্রতারণার দুর্গে আবর্তিত। কবি তার জোরালো উপস্থাপনার মাধ্যমে অসাম্যের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। ‘ছিঁড়ে ফেল মুখোশ’ নামের দীর্ঘ কবিতায় তাইতো কবির বলিষ্ঠ উচ্চারণ:

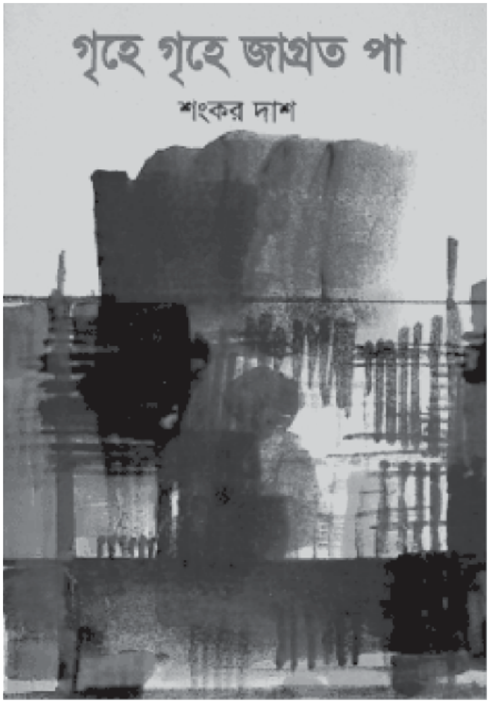

তোমার পোশাকে দর্জিশ্রম
খাবারে মেহনতি মানুষের ঘাম
পবিত্র গ্রন্থগুলি অভুক্ত শ্রমিকের হাতের নিপুণতায় উজ্জল।

কবির গভীর আর্তি–

হে প্রভু, আমাকে একরত্তি মানুষ হবার মন্ত্র দাও
চর্চিত বুদ্ধি, আহরিত জ্ঞান
কর্ষিত প্রজ্ঞা, বিদগ্ধ বিবেক
আজ কেন সর্বব্যাপী অন্ধকারের কাছে
অর্থহীন হয়ে যায়।

আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর ভণ্ড প্রতারকদের চরিত্র উন্মোচন করতে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন কবি। ‘ভড়ং’ কতিায় তিনি বলেন, ‘হয়তো বা আগেও মানুষের কথাবার্তা/ হিংস্র পশুর খ্যাকখ্যাকের মতই ছিল/ ভদ্রতা মেশানো মানুষের কথাবার্তা/ ভড়ং বৈ কিছু নয় ...।’

দ্রোহের আগুনে পোড়া কবি-হৃদয়ে যখন প্রেম বাসা বাঁধে তার উচ্চারণ ‘তা হলে কী’ কবিতায়– ‘তা হলে কী সত্যি আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তোমার কাছে?/তা হলে কী সত্যি আমি ছিলাম এক খেয়া পারের নৌকা?/তা হলে কী সত্যি আমি ছিলাম বিপন্ন লগ্নের ঔষধ?/তা হলে কী সত্যি আমার ভালবাসা ফুরিয়ে গেছে তোমার কাছে?’

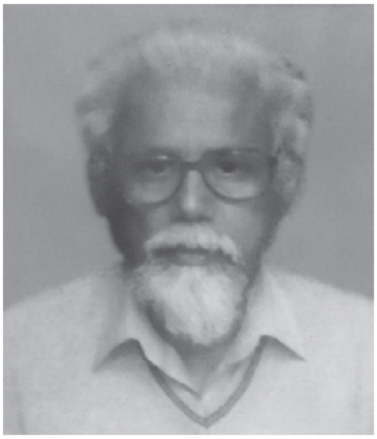

কবির চারপাশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই তার কবিতার পাত্র-মিত্র– গরীবুল্লা, সুপতা, উমা দিদি, ইয়াছিন, মকবুল, বিপিন, শশি, মজর আলী, দিপালী, সুশীলা, হালের মন্টু, তমালিকা। উঠে এসেছে গালিমপুরের মাঠ, ইছামতি ঘাট, হিজল, তমাল, মহুয়া, অশ্বত্থ বৃক্ষ; এসেছে কামারের হাপর, কৃষকের ধান, বান-বন্যা, শুকনো নদী ইত্যাদি।

কবি শংকর দাশের 'গৃহে গৃহে জাগ্রত পা' কাব্যগ্রন্থের পাঠকপ্রিয়তা কামনা করছি এবং তার আজন্ম লালিত স্বপ্নের সমাজ বিনির্মাণে মানুষের অসাম্য দূর হয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে, এ কামনায় শেষ করছি।

লেখক: সমাজকর্মী ও ছড়াকার।

প্রেমিক কবি 'ভালবাসার গান' কবিতায় কবি গেয়ে ওঠেন–

এসো কবরী এলায়ে স্বপ্ন জড়ায়ে দু'চোখে
এসো বাক্যহীনা শুকতারাগো আকাশ ছেড়ে মাটির এ বুকে
তুমি কি উধাও মেঘের মত আষাঢ় ছড়াবে শুধু আকাশে
তুমি এসো প্রাণ হোয়ে শরম বিধুর শিউলির পাশে
এসো স্নিগ্ধ মধুর চরণে এঁকে আলপনা
এসো লজ্জা রাঙা শাপলার পরাগ মাখানো বুকে।

'কুসুমিত ঘ্রাণ কবিতায়'-

আমাকে দেখি না আমি কুসুম কাননে
আকাশে সবুজে কিংবা বহতা নদীতে
আমাকে দেখি আমি তোমরই মুখে
স্নাত হই বার বার কুসুমিত ঘ্রাণে।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও ও সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত থাকার পরও আজও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা পায়নি। এ অবস্থায় কবির খেদোক্তি: 'বলো, আর কতকাল জ্রেবা ক্রসিং দিয়ে হেঁটে হেঁটে/বাংলা একাডেমীতে আসবে, পায়ের উপর পা রেখে বসবে/এবং শুদ্ধানন্দ অধ্যাপকের ভাষণে অভিভূত হয়ে বাড়ি ফিরবে ...।'

ইতিহাস ও পুরান যথাযথ পেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়েছে তার কবিতায়। 'রাধা ও দৌপদী' কবিতায়: 'জীবন কার দেনায় রাখিয়াছ বাঁধা/ চিরকালের বঞ্চিতা নিপীড়িত রাধা/ এবার অঞ্জলি ভেঙে নগ্ন করো হাত/ যাক কৃষ্ণ প্রেমের কলঙ্ক নিপাত/ এসো যে কামের কুঞ্জে আগুন জ্বালাই/ ঐ দেখো দ্রৌপদীর চোখে ঘুম নাই।'

প্রকৃতির প্রতি কবির যে ভালবাসা তা আমরা তাঁর 'তোমার প্রেম' 'ছোট নদী' ইত্যাদি কবিতায় দেখতে পাই। 'মানুষকে দাও' কবিতায় গাছের অপলক জীবন প্রবাহ, ফুলের অন্তহীন সুবাস, আকাশের বিশালতা, বাতাসের অক্লান্ত পথচলা, জলের শক্তি ইত্যাদি মানুষকে দেওয়ার জন্য কবি আকুতি জানিয়েছেন।

করোনা দিলো বিধবা শাড়ি

মনসুর আলম মিন্টু
ফিল্ড অফিসার, জিরানী ব্রাঞ্চ, সিদীপ

ছোট্ট খোকা সোনামনি
বয়স খুবই কম
তুরতুরিয়ে হেঁটে বেড়ায়
কয় না কথা কম।
মায়ের কাছে প্রশ্ন করে
বাবা কোথায় গেছে
দাও না এনে আমার বাবা
যাবো আমি কাছে ।
মায়ের চোখে মেঘের চাউনি
বৃষ্টি বুঝি ঝরে
কি করে মা বলবে তারে
বাবা গেছে মরে।
কষ্টের জীবন স্বামীবিহিন
সন্তান বুকে নিয়ে
হাজার ব্যাথা ভুলে আছি
তোরে খোকা পেয়ে ।
মার্চ মাসে করোনা এলো
বিশ্ব মহামারি
তোর বাবা যে পেল না রেহাই
নিলো প্রাণটা কাড়ি।
দুঃখের পাহাড় হলো জমা
কষ্টের নেই যে শেষ
জীবন নামের নৌকা বেয়ে
বেঁচে আছি বেশ ।
করোনা দিলো বিধবা শাড়ি
বুকে বিরহশিখা
তুই খোকা বেঁচে থাকার
সর্বশেষ রেখা ।

সুস্থ মানবিক সম্পর্কই সব সংগঠনের প্রাণ

শাহজাহান ভুঁইয়া

মানুষের সংগঠন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক যে রূপই হোক না কেন তা মূলত 'ব্যক্তি ও দলের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের একটি কাঠামো'। সম্পর্কের কাঠামোটি অনুলম্বিক, অনুভূমিক, তির্যক, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের হতে পারে যা সংস্থা বা সংগঠনটির প্রয়োজন ও লক্ষ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। একক ব্যক্তি হিসেবে একজন মানুষ পরিবেশের মাঝে একাকী, অসহায়, সীমাবদ্ধ, অপ্রয়োজনীয়, অকেজো, অর্থহীন ও গুরুত্বহীন একটি জৈবিক কণা মাত্র। এই অর্থহীনতা দূর হয় কেবল তারা সমষ্টিবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ হয়ে কাজে নামলে।

আদিম হোমো সেপিয়েন্স থেকে বর্তমান মনুষ্যত্বের পর্যায় পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রাকালে সামান্য পশুপ্রবৃত্তি থেকে আজকের বৌদ্ধিক উচ্চতায় মানুষের ক্রমউত্তরণ ঘটেছে। এ সময়ে বেঁচে থাকার দীর্ঘ সংগ্রামে মানুষ কেবল সামনে এগিয়েছে পরস্পর সম্পর্কিত ও একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে। মানুষের বৌদ্ধিক বিপ্লব ৩০ হাজার বছর আগে ঘটেছে বলে মনে করা হয় যার ফলে শিকার, খাদ্য সংগ্রহ ও বিপদ-আপদ মোকাবিলায় দলে বৃহত্তর সহযোগিতার জন্য তার বোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্পষ্ট যে সহযোগিতার মনোভাবের ফলে দলের বা সংঘের সদস্যদের বৌদ্ধিক-মানসিক ঐকতান বাঁচার ও অগ্রগতির বৃহৎ বিপ্লবগুলোয় বিরাট ভূমিকা পালন করেছে–১০ বা ১২ হাজার বছর আগে কৃষি বিপ্লব থেকে সাম্প্রতিক ৫০০ বছর আগে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব পর্যন্ত যা এক দুর্বল প্রজাতি থেকে মানুষকে শক্তিমান করে তুলেছে।

হোমো সেপিয়েন্সের ক্রমক্ষমতায়নের এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এটা স্পষ্ট যে কোনো মানবিক কর্মকাণ্ডে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে- তা সে মানুষের কোনো ক্ষুদ্র উদ্যোগই হোক বা রাষ্ট্রের মত বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানই হোক, সবক্ষেত্রেই। সহানুভূতিমূলক মানবিক সম্পর্ক সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মাঝে টনিক বা প্রাণসঞ্চারি প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে সংগঠনের অভ্যন্তরে পারস্পরিক বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক টক্সিক বা বিষময় পরিবেশ তৈরি করে সামগ্রিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। আধিপত্যবাদী, শোষণমূলক, দমনমূলক, নির্যাতনমূলক, অত্যাচারি বিমানবিকীকরণের পারস্পরিক সম্পর্ক সন্ত্রাস ছাড়া কিছুই নয়। সংস্থায় সহযোগিতার অনুকূল আবহাওয়া লালন করতে হলে সদস্যদের মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত বৌদ্ধিক-মানসিক ঐকতান বজায় রাখতে হবে যা উদ্ভাবন, সৃষ্টিশীলতা, উৎপাদনক্ষমতা ও অন্যান্য সকল ভাল উপাদানের বিকাশ ঘটাতে পারে।

সেজন্য যে কোনো সংগঠনে ভাল মানবিক সম্পর্কের চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে সচেতন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আগের প্রজন্মের কর্মীদের মনে ছিল যেকোনো কিছুর বিনিময়ে কঠোর পরিশ্রমের ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার নীতি। নতুন প্রজন্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সংগঠনে মানবব্যবস্থাপনায় মৌল পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ নতুন প্রজন্মের সদস্যরা তুখোড়, জ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ এবং স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের কাছে দায়বদ্ধ। তাদের কর্মনীতি হচ্ছে কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ও স্বাতন্ত্র্য।

এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে পূর্বের ইন্টেলিজেন্ট কোশেন্টের (IQ) বদলে আধুনিক ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সকে (EQ) বেশি কাজে লাগানোয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের জ্ঞান ও দক্ষতা

থাকতে হবে। কর্মীদের অনুভূতি ও আবেগিক দিক এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নেতৃত্বের ধরনে ও বৈশিষ্ট্যে এখন তিতা কথা ও রূঢ় ব্যবহারের চেয়ে মিষ্টি কথা ও সুন্দর ব্যবহার বেশি প্রয়োজন। কোনো কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য সকলের মানসিক ঐকতান জরুরি। বুদ্ধিবৃত্তি এখন পেশীক্ষমতার জায়গা দখল করছে। তাই প্রয়োজন প্রাণসঞ্চারি আবেগের উপস্থিতি। সংস্থায় সুন্দর মানবিক সম্পর্ক লালনপালনের জন্য ব্যবস্থাপনার যে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তা এখন কর্তৃপক্ষের নাগালে, তাই কাজে লাগাতে হবে।

ড্যানিয়েল গোলম্যান তার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বইতে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন কেন আইকিউ থেকে ইকিউ বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কিভাবে তা সংগঠনের বা দলের অভ্যন্তরে

এরকম নেতৃত্ব কর্মীদের মাঝে বৌদ্ধিক-মানসিক ঐকতান সৃষ্টিতে সক্ষম ও ফলে সংগঠনে পারস্পরিক সম্পর্ক হয় প্রাণসঞ্চারি। তারা দিনে গাছের গর্তে একা লুকিয়ে থাকা নিশাচর প্যাঁচা নন। তারা যার সঙ্গেই মেশেন তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলেন

প্রত্যেকের মানসিক স্বাস্থ্য ও পারস্পরিক মানবিক সম্পর্ক বজায় রেখে সম্মিলিত অগ্রগতিকে সহায়তা করে। দেখা গেছে আবেগিক সম্পর্কে ঋদ্ধ নেতৃত্ব দলে ক্রীড়াপটু। তারা সবসময় যোগাযোগের দরজা খোলা রাখেন ও সবসময় হাসিমুখ থাকেন। তারা মন দিয়ে অন্যের কথা শোনেন এবং যুক্তি ও আবেগের উভয়ের সাহায্যে কর্মীদেরকে আলোড়িত করেন। তারা নিজের মনোভঙ্গি অন্যের ওপর চাপিয়ে দেন না, বরং কাউকে কোনো কাজ বা দায়িত্ব অর্পণের সময় তার মনোভঙ্গি বিবেচনায় নেন। এরকম নেতৃত্ব কর্মীদের মাঝে বৌদ্ধিক-মানসিক ঐকতান সৃষ্টিতে সক্ষম ও ফলে সংগঠনে পারস্পরিক সম্পর্ক হয় প্রাণসঞ্চারি। তারা দিনে গাছের গর্তে একা লুকিয়ে থাকা নিশাচর প্যাঁচা নন। তারা যার সঙ্গেই মেশেন তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলেন।

আবেগিক বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিতে গোলম্যান নেতৃত্বের ছয়টি ধরন চিহ্নিত করেছেন– দূরদর্শী, শেখানোধর্মী, সম্মিলিত, গণতান্ত্রিক, লক্ষ্যভেদী ও আদেশমূলক। প্রথম চারটি ধরন সংগঠনে সকলের বৌদ্ধিক-মানসিক ঐকতান সৃষ্টি করে। আর শেষের দুটি ধরন অনৈক্যের বীজ বপন করে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ও নিজ সক্ষমতা অনুযায়ী নেতৃত্ব তার উপযুক্ত ধরনটি বেছে নেয়। যদিও লক্ষ্যভেদী ও আদেশমূলক নীতি মানসিক অনৈক্য সৃষ্টি করে জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করতে স্বল্প সময়ের জন্য তাও প্রয়োগ হতে পারে। বর্তমানকালে যখন কিনা সুযোগের জানালা অল্প সময়ের জন্য খুলেই বন্ধ হয়ে যায়, তখন নেতৃত্ব সফল হবে যদি কর্মীদেরকে সন্তুষ্ট রাখা যায়। যখন সংস্থায় মানসিক ঐকতান বিরাজ করে ও কর্মীদের মাঝে সন্তোষ বিদ্যমান থাকে, স্বাভাবিক ফল হিসেবেই লাভ, উদ্বৃত্ত ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যে কোনো মানবিক উদ্যোগ সফল হয়।

লেখক: ভাইসচেয়ারম্যান, সিদীপ

স্বাধীনতা মানে

দুর্জয় দাস

স্বাধীনতা মানে
প্রেমিকার খোঁপায়
রক্তে রাঙা কেশ
স্বাধীনতা মানে প্রতিবন্ধী শিশুর
শেষকৃত্যের নিঃশেষ।

স্বাধীনতা মানে বিলের জলে
রক্তে রাঙা জবা
স্বাধীনতা মানে শেখ সাহেবের
লক্ষ কোটি শ্রোতা।

স্বাধীনতা মানে কৃষ্ণচূড়ার
নির্মম ধর্ষণ
স্বাধীনতা মানে বিজয়ালক্ষ্মী
নারীর গর্জন।

স্বাধীনতা মানে ভাষার বুলেট
হুল ফুটায় ফুসফুসে
স্বাধীনতা মানে তাসের ঘর বানায় রাক্ষুসে।

স্বাধীনতা মানে বুদ্ধিজীবীর
আত্মবলিদান
স্বাধীনতা মানে বৃদ্ধা মায়ের
রক্তে গাওয়া গান।

স্বাধীনতা মানে লাল সবুজের পতাকা ছিনিয়ে আনা
স্বাধীনতা মানে নতুন দেশের
সূচনা কবে জানা।

সিদীপ উঠান স্কুলের ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীর আঁকা

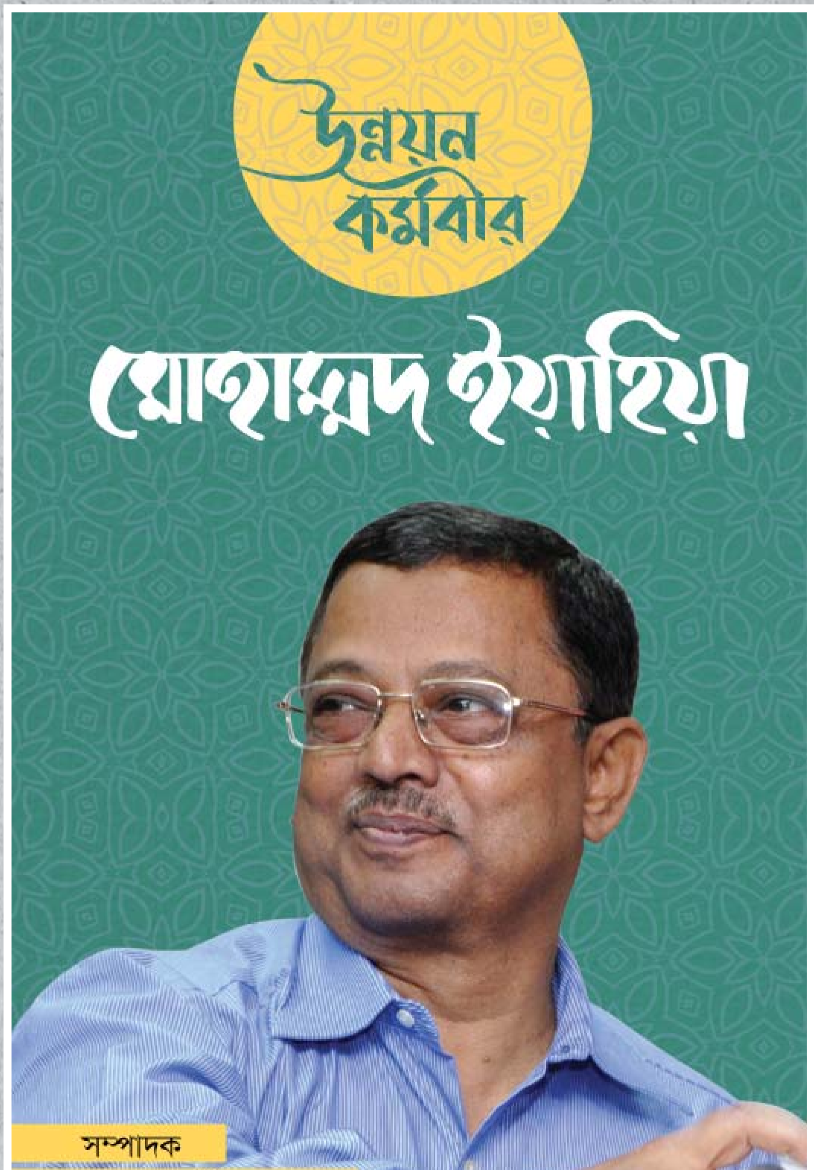
উন্নয়ন
কর্মবীর
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
সম্পাদক
আলমগীর খান